২৮ নভেম্বর ১৯৮৪ □ আনন্দবাজার প্রকাশন □ তিন টাকা

আনন্দমেলা

বয়েস অনুপাতে আপনার বাচ্চার ওজন কি ঠিক?

ওকি যতটা ঘুম দরকার তা পাচ্ছে?
ওর প্রথম দাঁত বেরোবে কবে?
আমি কি ওকে ওর প্রয়োজন মত যথেষ্ট পুষ্টি দিচ্ছি?
ও কবে স্থির হয়ে বসতে, আর ভর না দিয়ে দাঁড়াতে পারবে?

আপনার এই সমস্ত প্রশ্ন আর 'নতুন মায়ের' মনে আরো যত প্রশ্ন জাগে তার উত্তর দেবে **"শিশুর প্রথম বছরের খাতা"য়!** এটি হল আপনার জন্যে, নতুন ফ্যারেক্সের তরফ থেকে বিনামূল্যের উপহার!

"শিশুর প্রথম বছরের খাতা"য় ঠাসা আছে—আপনার সাহায্যের জন্যে বাচ্চার যত্নের নানান উপায়! এতে আছে বিশেষভাবে সৃষ্টি করা ২৩টি ফ্যারেক্স রন্ধন পদ্ধতি—যাতে আপনার বাচ্চার খাওয়ার সময়টি বাচ্চার এবং আপনার—দুজনের পক্ষেই দারুণ আনন্দদায়ক হয়ে ওঠে!

আজই আপনার কপির জন্যে লিখুনঃ

নতুন
দুধযুক্ত
ফ্যারেক্স
শক্ত আহার
স্বাস্থ্যের উৎস—গ্ল্যাক্সো

এই কুপনটি এই ঠিকানায় পোস্ট করুনঃ
গ্ল্যাক্সো ল্যাবরেটরীজ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড, পো. অ. বক্স 19119 (FCM-3) বম্বে 400 025.
অনুগ্রহ করে আমাকে এক কপি "শিশুর প্রথম বছরের খাতা" পাঠিয়ে দিন।
এই সঙ্গে পোস্টেজ ও অন্যান্য খরচ বাবদ 1/-টাকার স্ট্যাম্প পাঠালাম।

নাম ______________________

ঠিকানা ______________________

____

____

CLARION/B/GX/6/244 BEN

আনন্দমেলা

১২ অগ্রহায়ণ ১৩৯১ ।। ২৮ নভেম্বর ১৯৮৪ ।। ১০ বর্ষ ১১ সংখ্যা

বিশেষ রচনা
আমি তখন । ইন্দিরা গান্ধী ৬
গল্প
কাঠুরে আর কাঠঠোকরা । নবনীতা দেবসেন ১১
জ্বর । সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায় ১৩
নবকেষ্টর ভেলকি । হীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৩৩
ভেলভেলেটা । কার্তিক ঘোষ ৫৫
ধারাবাহিক উপন্যাস
কালো পর্দার ওদিকে । সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ২৩
উপন্যাস
মড়ার উপর খাঁড়া । নবকুমার বসু ৩৭
ছড়া ও কবিতা
ধর্, সোনা । সুভাষ মুখোপাধ্যায় ৮
গয়ারকাটা । রবীন সুর ৮
নকল ভীম । দেবব্রত ঘোষ ৩৫
ইতিহাসের গল্প
মানুচির আরও গল্প । প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত ১৭
স্মৃতিকথা
ব্যাটে-বলে । পঙ্কজ রায় ৫৪
শার্লক হোমসের গল্পমালা
কমলালেবুর পাঁচটি বীজ । অনুবাদ : সুভদ্রকুমার সেন ৫১
কাছে ও দূরে
সুন্দরবনে একদিন । চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য ৯
'সোমা, ঘাবড়ে যেও না' । সোমা দত্ত ২৯
লেখাপড়া
জেনে নাও । অরূপরতন ভট্টাচার্য ১৬
অর্থ জানো । দেব-সেনাপতি ২৫
সহজে ইংরেজি । প্রসাদ ২৫
বিদ্যালয়-পরিচিতি
খড়্গপুর রেলওয়ে হাইস্কুলের কথা । শ্যামলকান্তি দাশ ৬৬
ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট বয় ৬৬
খেলাধুলো
হাই-ওঠা ক্রিকেট । অশোক রায় ৬৩
পাহাড়-চুড়োয় সোনা জিতল মহমেডান । সম্রাট রায় ৬৫
চিত্রকাহিনী ও কমিক্‌স
টিনটিন ২০, রোভার্সের রয় ২৬, টারজান ৩২
সদাশিব ৪৮, গাবলু ৬০, ফ্ল্যাশ গর্ডন ৬১
অন্যান্য আকর্ষণ
ধাঁধা, শব্দসন্ধান ৪৬ ; মজার খেলা, উত্তর বটে, হাসিখুশি ৪৭
তোমাদের পাতা ৪৯

প্রচ্ছদ : সুধীর মৈত্র

সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত । দাম তিন টাকা । বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ১০ পয়সা ; উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে ১৫ পয়সা । পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা ।

* আপনি কি ছাত্র, বুদ্ধিজীবি, ব্যবসায়ী ?
* আপনার কি স্মৃতিশক্তি, চিন্তাশক্তি ও মনের একাগ্রতা কমে যাচ্ছে ?
* আপনি কি চিন্তা করতে করতে দুর্বল হয়ে পড়ছেন ? আপনার ঘুম ঠিকমত হচ্ছে না ?

তাহলে এখনই আপনার নিয়মিত প্রয়োজন

ব্রেনোলিয়া

স্মৃতিশক্তি ও স্বাস্থ্য সতেজ রাখার উৎকৃষ্ট টনিক

ব্রেনোলিয়া একটি উৎকৃষ্ট আয়ুর্বেদিক টনিক । যাহার পিছনে রহিয়াছে অর্ধ শতাব্দীর দুর্লভ অভিজ্ঞতা । ভারতীয় বনৌষধির অমূল্য সম্পদ ভাণ্ডারের সেই সব সম্পদ– অর্থাৎ ব্রাহ্মী, শতমূলী, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, যষ্টিমধু, আলকুশী ইত্যাদির যথার্থ প্রয়োগে তৈরী এই উৎকৃষ্ট টনিক । ব্রেনোলিয়া আপনার স্মৃতিশক্তি, চিন্তাশক্তি বাড়াইতে এবং শরীর সুস্থ ও সতেজ রাখিতে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে ।

ব্রেনোলিয়া কেমিক্যাল ওয়ার্কস্
১৩, মহারাজা ঠাকুর রোড, কলিকাতা- ৩১
ফোন নং—৪১-০০৬৯

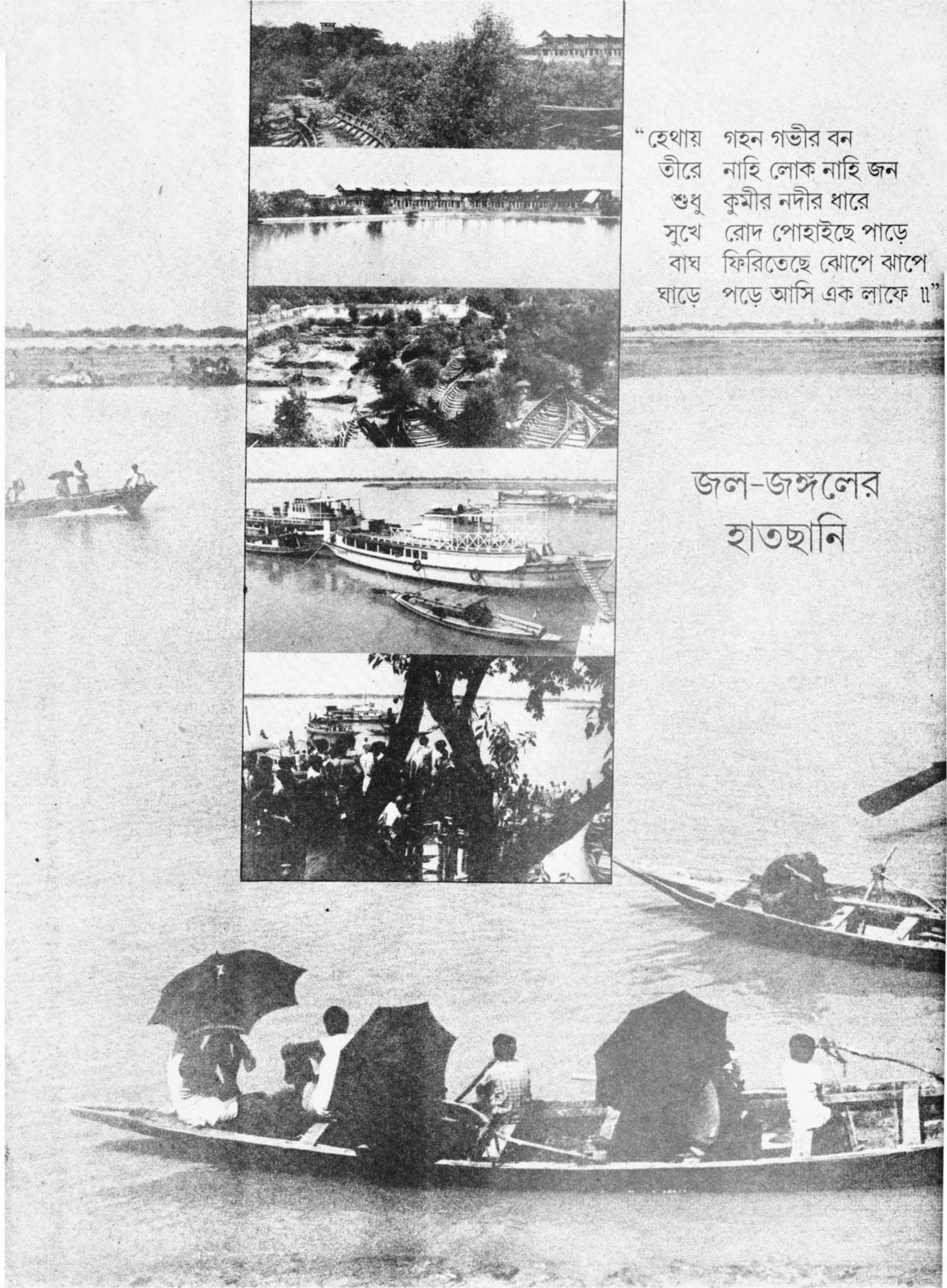

"হেথায় গহন গভীর বন
তীরে নাহি লোক নাহি জন
শুধু কুমীর নদীর ধারে
সুখে রোদ পোহাইছে পাড়ে
বাঘ ফিরিতেছে ঝোপে ঝাপে
ঘাড়ে পড়ে আসি এক লাফে ॥"

জল-জঙ্গলের হাতছানি

"সুন্দর চিতল" পর্যটন আবাসে রাত্রিবাস করে
বাঘ-কুমীরের দেশে ঘুরে এসো একবার।
সরকারি লঞ্চে চেপে গরান, হিন্তাল, সুন্দরীর জঙ্গল
আর আকাশের সীমায় হারিয়ে যাওয়া জলরাশিকে
দু চোখ ভরে দেখে নাও

টুরিস্ট ব্যুরো
৩/২ বিনয় বাদল দীনেশ বাগ (ইস্ট) কলকাতা ৭০০০০১ ফোন : ২৩-৮২৭১

আমি তখন
ইন্দিরা গান্ধী

আমি ষোলোয় পা দিলাম। বাবাও জেলে গেলেন। সেটা অবশ্য নতুন কিছু নয়। তিনি টেলিগ্রামে শুধু জানালেন, "ও-বাড়ি যাচ্ছি।"

মা তখন অসুস্থ। আমার যেমন কষ্ট, তেমনই ভাবনা। ওরই মধ্যে ব্যস্ত রইলাম পড়া আর নাচ নিয়ে। কেননা তারপরই ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিলাম আর সাধারণ থিয়েটারের স্টেজেও নামলাম একটিবার। সেই প্রথম, সেই শেষ।

বোম্বাইয়ের পালা শেষ করে যখন চলে আসছি, আমায় বিদায় জানাতে প্রায় গোটা স্কুলটাই আমার সঙ্গে শহরতলির ট্রেনে ভিকটোরিয়া টারমিনাস স্টেশনে এল। কারো কারো মা-বাবা পর্যন্ত। হাসি-কান্নার মাঝে গাওয়া হল পুরনো অনেক গান।

এতদিন আমি চেয়েছিলাম ছেলে হতে, কিন্তু ষোলোয় পা দিতেই মেয়ে হওয়ার মজাগুলি নিজেদের মেলে ধরল। ছিলাম লম্বা পা-ঢাকা-ফ্রক-পরা একটা ডানপিটে মেয়ে, হঠাৎ রাতারাতি হয়ে গেলাম শাড়ি-পরা তরুণী—ইয়াং লেডি যাকে বলে।

মায়ের কাছে থাকতে কলকাতায় এলাম। পনেরো দিন অন্তর দু'জনে বাবার সঙ্গে জেলে দেখা করতে যেতাম। সময় মোটে কুড়ি মিনিট! মন তাতে কি ভরে? কিন্তু স্মৃতি তাতেই ভরে থাকত। মা আর আমি দু'জনে রামকৃষ্ণ মঠে অনেক সময় কাটাতাম। গঙ্গার ধারে চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার এক নতুন জগৎ আমার সামনে খুলে যেত।

কিছুদিন পরে বিশ্বভারতীতে পড়তে গেলাম। অপরিচিত পরিবেশে চিরকালই আমি ভীষণ জড়সড়ো। গুরুদেবের সেই মহিমময় সান্নিধ্যে আরও যেন অভিভূত হয়ে পড়লাম। কাছে গিয়ে তাঁর সময় নষ্ট করার সাহস আমার হতই না, যদি না তাঁকে অবহেলা করছি বলে তিনি নিজেই নালিশ তুলতেন। আমাদের সকলের উপর তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। আশ্রমের কোথায় কী ঘটছে, সব কিছুরই বুঝি খবর রাখতেন। তাঁর পায়ের কাছে বসে কত যে সন্ধ্যা কেটেছে আমাদের ছোট্ট দলটির—নানা বিষয়ে আলোচনা করে। কখনো বা চুপচাপ তাঁর ছবি আঁকা দেখে। প্রায়ই তিনি কিছু পড়ে বা আবৃত্তি করে শোনাতেন। কী শান্ত, আনন্দময় ছিল সেই মুহূর্তগুলি! স্মৃতির মণিকোঠায় আজও সঞ্চিত হয়ে আছে।

আমার ঠাকুমা এই সময় আমার বিয়ের ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন। মা আমার দিকে ছিলেন বলে ফাঁড়াটা তখনকার মতন কাটল। অনেকগুলি সম্বন্ধের মধ্যে একটি প্রস্তাব এসেছিল ফিরোজ গান্ধীর কাছ থেকে। আরেকটি এসেছিল এক অপরিচিতের কাছ থেকে—যা নিয়ে আমরা অনেকদিন পর্যন্ত হাসাহাসি করেছি। কিন্তু সে অন্য কাহিনী।

আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকী ১৩৭৯ থেকে পুনর্মুদ্রিত

দেশনেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আকস্মিক প্রয়াণে আমরা মর্মাহত । ভারত-রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতা ও ঐক্যকে অক্ষুণ্ণ রাখবেন, এই ছিল তাঁর প্রতিজ্ঞা । প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে গিয়ে নিজের প্রাণ তিনি উৎসর্গ করেছেন । তাঁর স্মৃতির প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাই ।

শ্রীমতী গান্ধী বলতেন, "ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য সংগ্রাম, ঐক্যের জন্য সংগ্রাম, এ শুধু কথার কথা নয়, হৃদয় ও চিত্ত দিয়ে এই আদর্শকে গ্রহণ করতে হবে ।" তা যদি তোমরা করো, তাহলে সেটাই হবে তাঁর প্রতি তোমাদের শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা ও অনুরাগের অভিব্যক্তি ।

ধর্, সোনা

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

মুন্সিগঞ্জ লৌহজঙ্গ তারপাশা
দাদা বিলেতে, তার নেই ফেরার আশা।

ভাগ্যকুল ভাওয়াল গোয়ালন্দ
ঘরটা করেছে একদম লণ্ডভণ্ড।

মহিষবাথান ভেড়ামারা রাজবাড়ি
দাদামশাই বেজায় রাশভারী।

সাড়াঘাট পোড়াদহ পাকশি
পেয়ারা পারে যে এনে দেবে আঁকশি।

চুয়াডাঙা জয়রামপুর দর্শনা
দুধ আনব, খোকাকে একটু ধর্, সোনা ॥

গয়ারকাটা

রবীন সুর

আয়, দুজনে দিয়ে হাঁটা
বেড়াতে যাই গয়ারকাটা।
সেইখানে বয় আংরাভাসা,
বর্ষাকালে সর্বনাশা।

ছড়িয়ে আছে মস্ত বন,
মেহগনির গুপ্তধন।
খুঁটিমারির ডাকবাংলো,
সারাটা রাত জেগে কাটল।
শিউরে ওঠে ভয়ে গা'টা,
বাঘ নেই তো ডোরা-কাটা?

সোনার বরন ডায়না নদী
বইছে দেখি নিরবধি।
বন পেরিয়ে যেই না থামছি,
অমনি ভুটানদেশের সামচি।

দেখবি ডলোমাইট-নুড়ি
ট্রাকে যাচ্ছে ধূপগুড়ি।
আর দেখবি দূরে-কাছে
চায়ের বাগান ছড়িয়ে আছে।

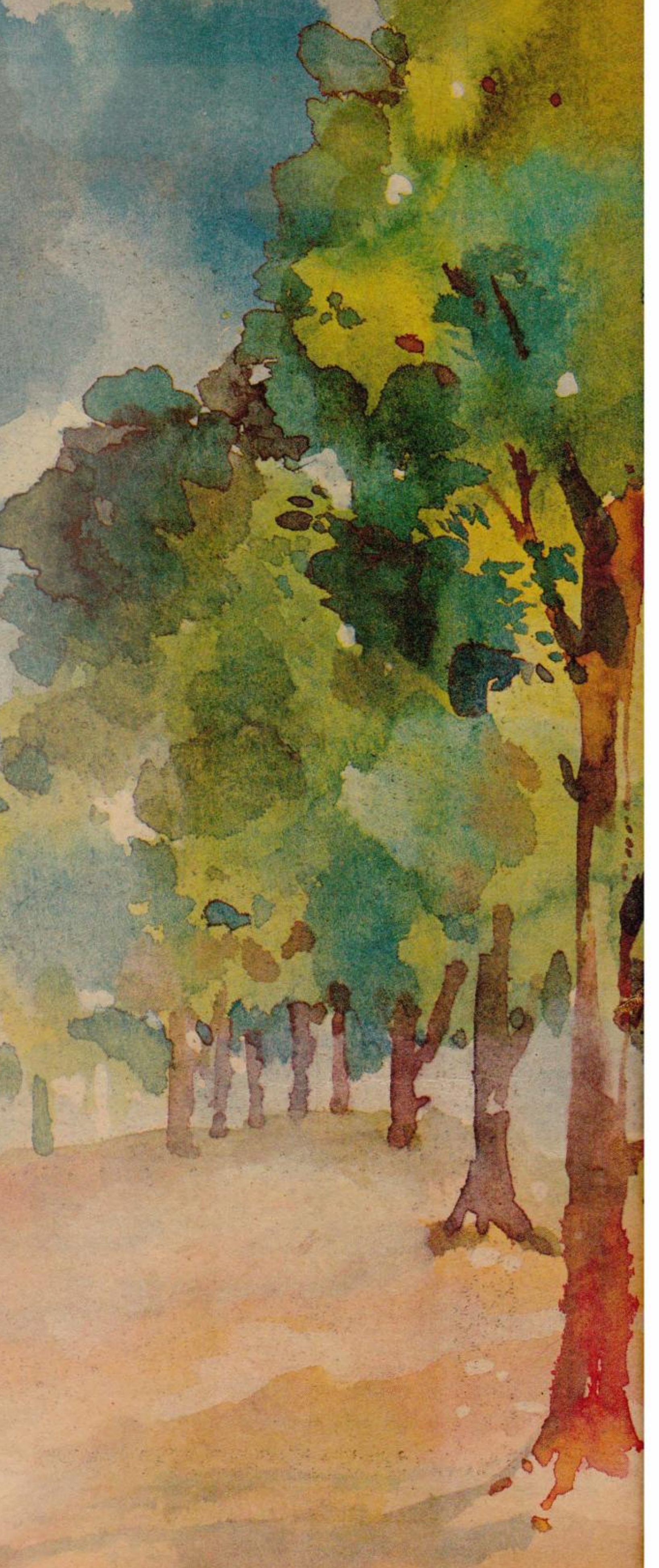

ছবি : অনুপ রায়

সুন্দরবনে একদিন

চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য

বাস ছেড়েছিল বি· বা· দী· বাগ থেকে, সকাল সাড়ে ছটায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন বিভাগের সাজানো-গোছানো বাস। রোববার, তাই রাস্তাঘাট একেবারে ফাঁকা। বাস ছুটেছে ঝড়ের বেগে। পার্ক স্ট্রিট, পার্কসার্কাস, তারপর ধাপা। চারদিকে উঁচু-উঁচু ময়লার পাহাড়। একটু এগোতেই ঘন সবুজ সব্জিখেত। তারপরেই খালি জলা আর জলা। শুনলুম, ওকে নাকি মেছো-ভেড়ি বলে। জলের মধ্যে বাঁশের মাচার ওপর ছোট ছোট ঝুপড়িমতন। ওর ভেতরে পাহারাদার নাকি মাছ পাহারা দেয়।

রাস্তায় মাঝে-মাঝেই দেখতে পাই সাইকেলের ক্যারিয়ারে মাছের গামলা চাপিয়ে চলেছে মাছওয়ালারা কলকাতার দিকে। ড্রাইভারকে বলি, "ও ড্রাইভার-সাব! রোক্কে,

রোক্কে। একটু চা খেতেও কি দেবে না।" আসলে চা খাওয়াটা ছুতো, নামব মাছ দেখতে। নেমে মাছের দাম জিজ্ঞেস করি। ছোট ছোট ট্যাংরা এক টাকা কিলো। দু' কিলো নিলে দেড় টাকা, মাঝারি পার্শের কিলো পাঁচ টাকা। তাজ্জব কাণ্ড, কলকাতায় যে এই মাছই বাইশ টাকায় বিক্রি হচ্ছে! ওদিকে বাসের ভেঁপু বেজে ওঠে। দুদ্দাড় করে যে যার আসন দখল করি। এবার আরাম করে বসে গাড়িতে পাওয়া খাবারের বাক্স খুলি, ব্রেড রোল, মাখন, দুটো ডিম, কলা, সন্দেশ, হরেক খাবার!

এই দ্যাখো, কোথায় চলেছি সেটাই তো বলিনি। যাচ্ছি **সুন্দরবন**। সুন্দরবন বললেই চোখের সামনে বাঘ আর কুমিরের ছবি জ্যান্ত হয়ে ওঠে। তাই মনে একটু ভয়ও যেমন ছিল, তেমনি উত্তেজনাও। সেই উত্তেজনায় খাবার-দাবার সব এক নিমেষে পেটে পুরে ফেললুম। তারপর রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কখন যে সোনাখালি পৌঁছে গেছি, টেরও পাইনি। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি, সাড়ে দশটা!

বাস থেকে নেমে একটু এগিয়ে যেতেই নদী। বিস্তর নৌকো, লঞ্চ, স্পিড বোট। সাধারণ নৌকোতে অনেকেই ভটভটি মেশিন লাগিয়ে নিয়েছে, যাতে দাঁড় বাইতে না হয়। আমরা যে লঞ্চটায় উঠলাম সেটা বন বিভাগের। আমি আর আমার সঙ্গী বিপুল নীচে নেমে একটা কেবিন দখল করে ফেললুম। সুন্দর বিছানা পাতা। বালিশ, তাকিয়া, মাথার ওপরে ছোট পাখা। কাঁচের জানলা খুলে দিতেই ফুরফুরে মিষ্টি হাওয়া। আমাদের একটু আগে-আগে যাচ্ছিল পর্যটন বিভাগের বোট মধুকর। আমরা তরতর করে তাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতেই ওদের যাত্রীদের মুখচুন। পরে

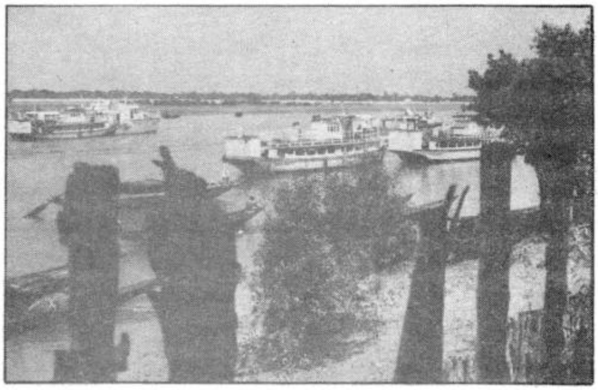

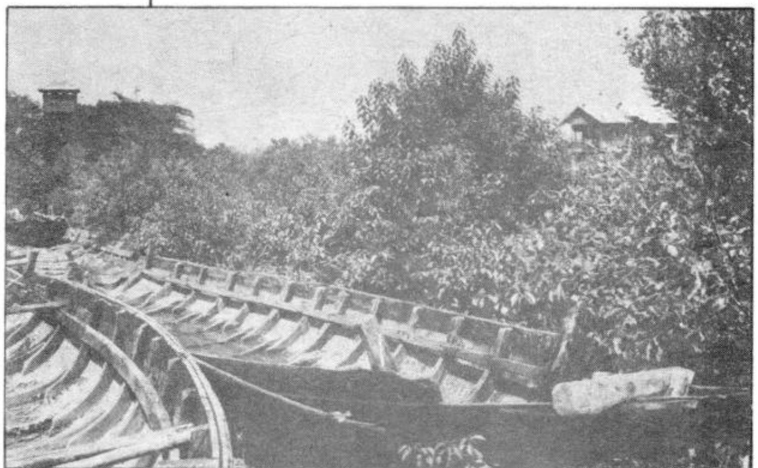

শুনেছিলুম, আমাদের আগে পৌঁছুবার ব্যবস্থাটা নাকি প্রথম থেকেই ঠিক করা ছিল।

যাত্রা শুরু হয়েছিল মাতলা নদীর মাতাল হাওয়া খেতে খেতে। এবার ক্রমশ এদিক-ওদিক থেকে আসা খালবিলে পড়ে কখন দিক-ভুল হয়ে গেছে বুঝতে পারিনি। দুপাশে হেঁতাল গাছ, গরান গাছ। গাঁয়ের ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা বাঁকে-বাঁকে দাঁড়িয়ে আমাদের দ্যাখে, আর হাত নেড়ে অভ্যর্থনা করে। খালগুলোর নাম ভারী সুন্দর। গোসাবা, পাঠানখালি। দেখা মেলে বাগনা, বিদ্যার মতো নদীর। চারদিকে জল আর জল। একজনকে তো দেখলুম রেলিঙের ধারে দাঁড়িয়ে হাত-পা ছুঁড়ে রবীন্দ্রনাথ আওড়ে যাচ্ছেন, "জল শুধু জল"। কেন জানি না, আমার ফেলুদার গল্পের জটায়ুর কথা মনে পড়ে গেল।

ক্রমে আমরা গিয়ে পৌঁছুলুম সজনেখালি। এখানে আছে পক্ষীনিলয়। আছে হরিণবন। ঘাটের কাছে আসতেই অন্যান্য নৌকো থেকে সমবেত কণ্ঠের চিৎকার। ইস্, পাঁচ মিনিট আগে এলে না! দেখতে পেতে হাঁ-করা কুমির! শুনে আমাদের আপসোস। তারপর পাড়ে নেমে দেখি ভিড়ে ভিড়াক্কার। আজ সজনেখালির সুন্দর-চিতল টুরিস্ট-লজটির উদ্বোধন হবে। আমি আর বিপুল ছিটকে একটু অন্যপথে যেতেই সব্বাই হাঁ-হাঁ করে উঠল। চলে আসুন। চলে আসুন। বাঘে ধরবে। এদিকে বিপুল তো বাঘ ধরতেই বেরিয়েছে ক্যামেরা নিয়ে। আমি তখন দেখি একটা সুন্দর পুকুর। টলটল করছে নীল জল। সুন্দরবনের ঘোলাজলের সঙ্গে মিল নেই একেবারেই। শুনলুম ওটা নাকি আকাশের জল। ধরে রাখা হয়েছে মাটি কেটে গর্ত খুঁড়ে।

এদিকে নদীর পাড়ের ভিজে মাটিতে টম্যাটো রঙের লাল টুকটুকে কাঁকড়া, ব্যস্তসমস্তভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি চেয়ে চেয়ে দেখি। ওদিকে একটু উঁচু ঘর টঙের মাথায়। ওটার নাম ওয়াচ টাওয়ার। ওপরে উঠে রাতে দেখা যায় বাঘ হরিণের আনাগোনা। তা এত হট্টগোলের মধ্যে কোন্ বাঘ আসবে? এদিকে মিটিং শুরু হয়ে গেছে। সেদিকে ছুটে যাই। মিটিং-এর শেষে খাওয়া-দাওয়া, বিরিয়ানি, ছোলার ডাল, ফুলকপির ডালনা, মুরগি, চাটনি, রসগোল্লা আর দই। এর পরে আর নড়তে ইচ্ছে করে? কিন্তু অনেকেরই বোধহয় ছিল খুব তাড়া। ফল যা হবার তাই। লঞ্চে উঠতে গিয়ে নৌকো উল্টে-টুল্টে সে এক বিচ্ছিরি কাণ্ড।

পর্যটন বিভাগের ডিরেক্টার মুখার্জিসাহেব বললেন, "পরে আর একবার নিয়ে আসব আপনাদের। এই সুন্দর-চিতলে রাত্রিবাস করে স্পিডবোটে খাঁড়ি বেয়ে ব্যাঘ্রপ্রকল্প কুমিরপ্রকল্প দেখে যাবেন। আজ উঠুন লঞ্চে, ফিরতে হবে।" কিন্তু ফিরতে কি ইচ্ছে করে! ওদিকে সূর্যদেব ডিমের কুসুমের মতো রঙ ধরেছেন। সারা জলে আবির গোলা। সেই আবিরগোলা জল কেটে কেটে লঞ্চ চলতে থাকল সোনাখালির দিকে। ডেকের ওপর থেকে হঠাৎ গান শোনা গেল, ওরে গহিন গাঙের নাইয়া। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি, সেই জটায়ু। তার গান শুনতে শুনতেই আমরা সন্ধে সাতটা নাগাদ ফিরে এলুম সোনাখালিতে।

আলোকচিত্র : বিপুল গুহ

কাঠুরে আর কাঠঠোকরা

নবনীতা দেবসেন

এক মস্ত বনে একটা ছোট্ট রঙিন কাঠঠোকরা পাখির ছানা থাকত। তার মা ছিল না, বাবা ছিল না, ভাই ছিল না, বোন ছিল না। কেবল একটা ঝুঁটি ছিল আর একজোড়া ঠোঁট ছিল। সে ছোট্ট হলে কী হবে, ঠুক্‌ঠুক্‌ করে কাঠ ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে দিব্যি গর্ত করতে পারত। কাঠঠোকরার যা স্বভাব।

সেই বনে এক কাঠুরে যেত। সে খুব বুড়ো হয়ে গেলে কী হবে, সেও ঠুক্‌ঠুক্‌ করে কুড়ুল মেরে দিব্যি ছোট-ছোট শুকনো ডাল কাটতে পারত। ছোট গাছ সে কাটত না মায়া করে। ছেলেমানুষ গাছ তো, এখনও বড়ই হয়নি, কেটে ফেলে কেমন করে? আর বড় গাছও সে কাটত না। বুড়ো মানুষ তো, গায়ে অত শক্তি নেই যে, অ্যাত্তোবড় গাছটা কাটতে পারে।

সে রোজ যখন কাঠ কাটে, কাঠঠোকরা পাখির ছানাও তখন কাঠে গর্ত করে। দুজনে বেশ দেখা হয়। দেখতে দেখতে ভাবও হয়ে গেল। বুড়ো যখন দুপুরে টিফিন খেত, কাঠঠোকরাকে তু-তু করে ডেকে একটুকরো রুটি কি একটুখানি পেয়ারা খেতে দিত। কাঠঠোকরাও মনের আনন্দে খেত।

একদিন বুড়ো বললে, "উঃ, আর পারি না। আমার যদি একটা ছেলে থাকত!"

কাঠঠোকরা বললে, "কেন কাঠুরেমশাই, ছেলে দিয়ে আপনি কী করবেন?"

"কী আর করব, ছেলে থাকলে সেই তো আমাকে খাওয়াত। আমি এই বুড়ো বয়েসে আর কাঠ কাটতে পারি না।"

কাঠঠোকরা বললে, "আপনি তো রোজ আমাকে খাওয়ান, এবার বরং আমিই আপনাকে খাওয়াব। আপনি আমার বাবা হবেন?"

কাঠুরে তো শুনে হেসেই বাঁচে না। বললে, "ও পাখি, ও সোনামণি পাখি, তুই কেমন করে আমাকে খাওয়াবি বাছা? আমার কি পাখির আহার? আমার রুটি চাই, তরকারি চাই, ভাত চাই, ডাল চাই, চা চাই।"

"ও বাবা, এত?"

"হ্যাঁ বাছা, এত। মানুষের পেট বড় ভীষণ গর্ত। কিছুতে ভরে না! যাই হোক আজ থেকে বাছা তুমি আমার ছেলে।"

শুনে কাঠঠোকরার খুব আনন্দ হল। সে বনের রানি বনদেবীকে গিয়ে বলল, "রানিমা, এই কাঠুরে আমার বাবা। এখন বুড়ো হয়েছে, তার সারাজীবন এই জঙ্গলে কেটেছে, তুমি এবার তাকে খাওয়াও। সে আর পারে না। দ্যাখো, সে খুব ভাল লোক, মরা শুকনো ডালপালাই কাটে, কচি ডালে কুড়ুল ছোঁয়ায় না।"

বনদেবী বললেন, "ঠিক আছে, তোমার ওই বুড়ো বাবাকে আর কাঠ কাটতে হবে না। সে বরং আমার বন সাফাই করুক। যত মরা ডাল, শুকনো পাতা, সুবিধেমতো পরিষ্কার করুক, তাকে আমার বনের বনমালী করে দিলুম।"

কাঠঠোকরা নাচতে নাচতে উড়তে উড়তে এসে বললে, "বাবা, বাবা, আমি তোমাকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেছি! তুমি এই বনের বনমালী হয়েছ, বনদেবী নিজেই এবার থেকে তোমার খাবার দেবেন।"

বুড়ো কাঠুরে আহ্লাদে আটখানা হয়ে কাঠঠোকরার ঝুঁটিতে, ডানাতে হাত বুলিয়ে আদর করে বললে, "যাক, সত্যি সত্যিই একটা ছেলে পেলুম তাহলে।"

তারপর থেকে বুড়ো কাঠুরে আর ছোট্ট অনাথ কাঠঠোকরা একসঙ্গে বনে ঘুরে বেড়াত। একজন ঘুমোত গাছের কোটরে, একজন গাছের তলায়। একজন খেত বনদেবীর দেওয়া ভাল-ভাল প্রসাদ, আরেক জন তাতে ভাগ বসাত মনের আনন্দে। বনদেবী দেখে হাসতেন।

অনাথ ছানা বাবা পেল,
বুড়ো কাঠুরের ছেলে হল,
আয় রে ছোটন, বনে যাই,
বনদেবীর প্রসাদ খাই।
বনদেবী না বন্‌বিবি?
হাত পেতেছি, বর দিবি?
বর পাবি না কাঁচকলা—
ঠুক্‌রে দেব, যাঃ, পালা!

ছবি : অনূপ রায়

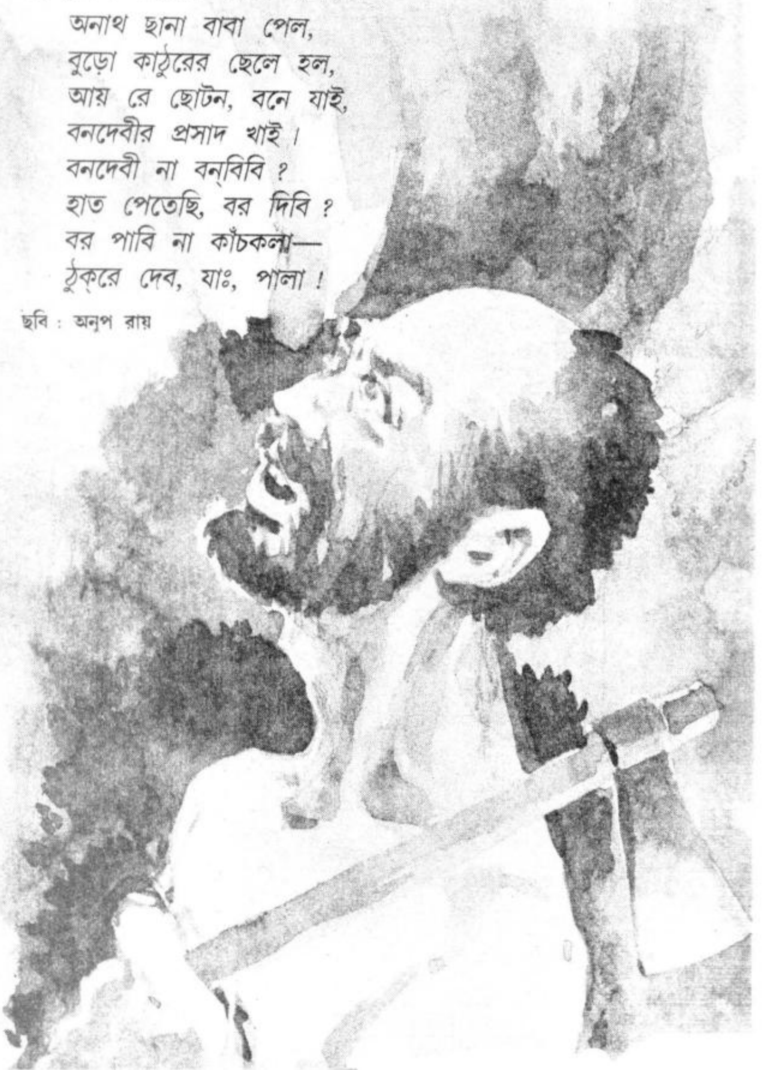

নিশ্বাসে দুর্গন্ধ? দাঁতের ক্ষয়? আর নেই ভয়!

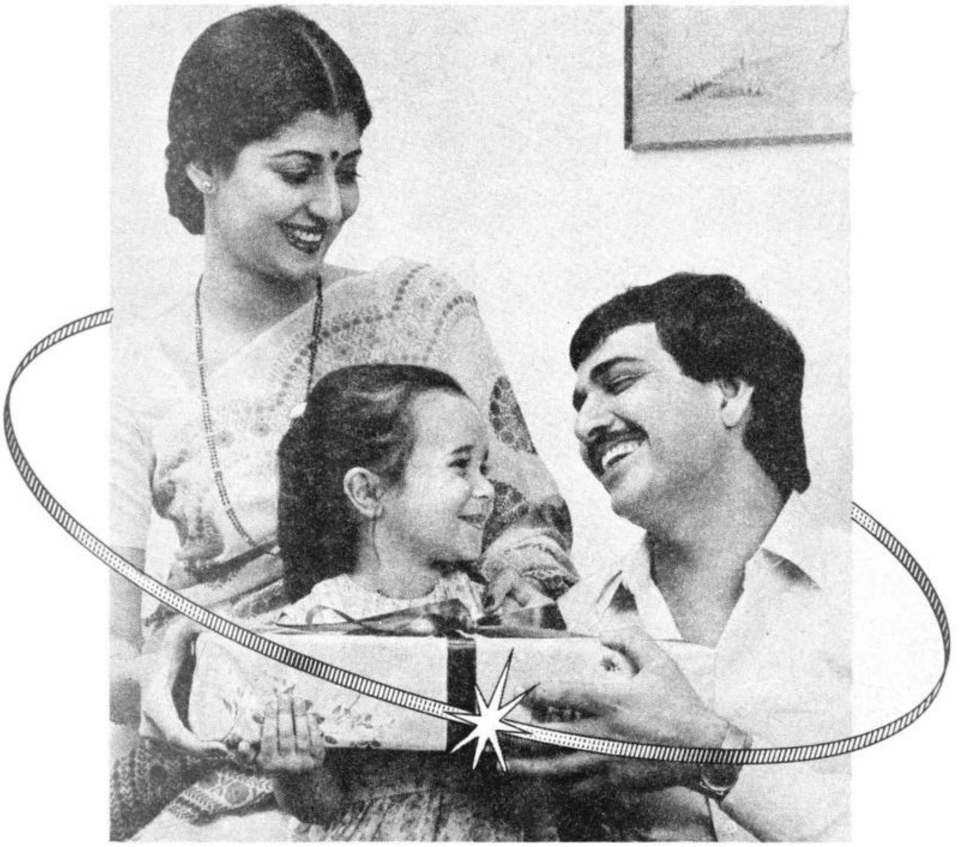

আপনাদের ঘিরে আছে কোলগেটের সুরক্ষাচক্র!

নিয়মিত কোলগেট ব্যবহার সারা পরিবারকে দেয় সুস্থসবল দাঁত
আর তাজা নির্মল নিশ্বাস। এর থেকেই তো আসে আত্মবিশ্বাস!
আর কোলগেটের তাজা মিন্টি স্বাদ কার না পছন্দ!

প্রতিবার দাঁত মাজার সময়ে কোলগেটের বিশিষ্ট ফর্মূলা কীভাবে কাজ করে দেখুন।

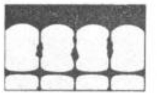

দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাবারের টুকরো থেকেই নিশ্বাসের গন্ধ আর দাঁত ক্ষয়ের শুরু।

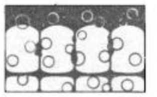

কোলগেটের অজস্র সক্রিয় ফেনা দাঁতের ফাঁকে ঢুকে এই ক্ষয়ক্ষতিকারী খাবারের কণাগুলো বার করে আনে, রোগজীবাণু হ'তে দেয় না।

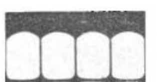

ফলে দাঁত থাকে সুস্থসবল, নিশ্বাস হয় ঝরঝরে তাজা।

প্রতিদিন নিয়মিত কোলগেট দিয়ে দাঁত মাজতে ভুলবেন না। সম্ভব হ'লে প্রতিবার খাবার পর।
নিশ্বাসে দুর্গন্ধ? দাঁতের ক্ষয়? আর নেই ভয়!
আপনাদের ঘিরে আছে কোলগেটের সুরক্ষাচক্র।

কি তাজা মিন্টি স্বাদ!

GK&E.B84.55 Ben

জ্বর সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায়

বিল্টুর ম্যালেরিয়া হয়েছিল। সারা কলকাতা শহরে এখন খুব ম্যালেরিয়া হচ্ছে। জ্বরের সময়টা একেবারে বিভীষিকার মতো। হঠাৎ সারা গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল, মুখের ভেতরটা বিস্বাদ হয়ে জল কাটতে লাগল, তারপর শুরু হল কাঁপুনি। আর থার্মোমিটারের পারা নেচে নেচে ওপরে উঠতে লাগল। ১০৪, ১০৫, ১০৬ ডিগ্রি। তখন সারা মাথায় ঠাণ্ডা জলের ধারানি দাও। আর জ্বর ছাড়লেই সব পরিষ্কার। ভাত, তেঁতুলের চাটনি-টাটনি খেতে ইচ্ছে করে।

মাসখানেক ধরেই শুরু হয়েছে। সেদিনই বুড়ো

মাস্টারমশাই এসেছিলেন। কী ভালবেসে যে এক প্যাকেট হরলিক্স-বিস্কুট কিনে এনে দিয়ে গেলেন। "এলাহাবাদে বড় ছেলের কাছে চলে যাচ্ছি বাবা।"

ছেলেবেলা থেকেই বুড়ো মাস্টারমশাইকে বুড়ো দেখেছে বিল্টু। এবারের নতুন ক্লাসে ওঠার পর বুড়ো মাস্টারমশাইও পড়ানো ছেড়ে দিলেন। "ওসব ফিজিক্স কেমিস্ট্রি আমি পড়াতে পারব না বিভূতি।" বিল্টুর বাবা বিষণ্ণ মুখে বলেছিলেন, "মাঝে-মাঝে আসবেন মাস্টারমামা।" বুড়ো মাস্টারমশাই ঠামার দূর সম্পর্কের ভাই হন। সেই সুবাদে বাবার মামা। সারা জীবন ছেলে পড়িয়ে কেটেছে তাঁর। বিল্টু ওঁকে বড্ড ভালবাসত। আজ ভোর রাত্তিরে ওঁকে স্বপ্ন দেখেছে। মাথার কাছে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। পুবের জানলাটা খোলা। ব্ল্যাকিও ওঁকে খুব ভালবাসত।

যাক্, গত পরশু থেকে জ্বরটি আর আসেনি। ইতিমধ্যে বাড়িতে এক পেল্লায় কাণ্ড হয়ে গেছে। তাতেই বিল্টু বুঝতে পেরেছে যে, সারা বাড়িতে ছোটকা, হিরুদা আর ব্ল্যাকি ছাড়া ওর কোনো বন্ধু নেই।

বিল্টুর বাবা ব্যারিস্টার বি বি মুখার্জি একটি নতুন কণ্টেসা গাড়ি কিনেছেন। পুরনো হিলম্যানটা ছোটকার বরাতে জুটেছে। গত বেস্পতিবার যখন কালীঘাটে পুজো-টুজো দিয়ে, লাল জবাফুলের মালায় সাজিয়ে জলপাইরঙের গাড়িটা বাবাকে নিয়ে বাড়িতে ঢুকল, তখন বিল্টুর ধুমজ্বর। জলপটি চলছে। মা অমনি মাথার কাছ থেকে উঠে গিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে পোঁ-পোঁ করে শাঁখ বাজাতে লাগলেন। আধ ঘণ্টা আর দেখাই নেই! শুধু ছোট্কা একবার উঠে উঁকি মেরে দেখে এসে বললেন, "ঐ দেখতেই চকচকে, বুঝলি।" ব্ল্যাকিও বারান্দায় গিয়ে অনুসন্ধিৎসু ভাবে একবার 'গ্রাউ' করে ডেকে

ফিরে এসে গুটিসুটি মেরে বসল। আর হিরুদা নড়লই না। মাথার পট্টিটা পাল্টে দিতে দিতে বলল, "গাড়ি তো আর পালাচ্ছে না! কী বলো?" বলে মাথায় হাত বুলোতে লাগল।

একটা নতুন গাড়ি নিয়ে কী আদিখ্যেতা রে বাবা সারা বাড়িতে! জয় রাইড হচ্ছে, পার্টি হচ্ছে, আর রাত্তিরে মা সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে বলছেন, "তুই সেরে ওঠ, তারপর আমরা নতুন গাড়িটা নিয়ে ডায়মণ্ড হারবার বেড়াতে যাব।" আর এদিকে চুপি-চুপি বোটানিক্যাল গার্ডেন, দক্ষিণেশ্বর এসব ঘোরা হয়ে গেছে! বোঝো একবার— !

জ্বরটা পরশু থেকে আর আসেনি। ভায়োলিনের মাস্টারমশাই এখন ওকে ঠাট রাগগুলো চেনাচ্ছেন। বিলাবলের চলন আর মুখড়া গত্ শিখে বিল্টু এখন রাগ ভৈরব ধরেছে। বিলাবলে সব শুদ্ধ স্বর। ভৈরবে কিন্তু কোমল গা আর কোমল ধা লাগে! ধা লাগাবার সময় শিরদাঁড়ায় খচ্ করে লাগল। পিঠে একটা আড়ষ্ট ব্যথা থেকেই গেছে। একটু বাজাতেই কান ভোঁ-ভোঁ করতে লাগল।

বেহালা বাক্সবন্দী করে, বুকর‍্যাক থেকে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চাঁদের পাহাড়' বইটা খুলে বালিশে হেলান দিয়ে বসল বিল্টু। হিরের গুহায় শঙ্কর যেখানে নুড়ি ভেবে হিরে দিয়েই পথচিহ্ন রেখে হামাগুড়ি দিয়ে চলেছে, ঠিক সেই জায়গাটায় এসে পড়তেই পর্দা সরিয়ে ছোটকার দুষ্টুমিভরা হাসিমুখ উঁকি মারল।

"বিল্টু! নীচে আয়।"

"হোয়াই?"

"আয় না তাড়াতাড়ি।"

"আজকের মতো তোমার চাকরি খোঁজা শেষ?"

"শাট্ আপ্। তুই কি আমার গার্জেন?"

"আহা চটছ কেন? সকালেই তো ঠামা বলল যে, কোন রাজকার্যে বাহার দিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তখন বললে না, যে চাকরি খুঁজতে..."

"চাকরি খুঁজতেই তো প্লাজায় গেলুম।"

"প্লাজা সিনেমা হলে, চাকরি? সেখানে তো ব্রুস লি চলছে!"

"আজ্ঞে না, সেখানে একটি ম্যানেজার প্রয়োজন—ইডিয়েট্।"

"দ্যাখো, আমায় যা-তা বুঝিয়ো না। সিনেমা হল ম্যানেজ করতে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট লাগে না।"

"আঃ, বড়দের মুখে-মুখে তক্ক কোরো না বিল্টু। নীচে গাড়িতে তেল ভরেছি, চক্কর মারবে তো চলো।"

"আমি কন্টেসায় চড়ব না।"

"আরে, আমরা পাহাড়ি মানুষ। আমরা হিল্‌ম্যানে চড়ব।"

"হুররে!

ঠিক ইস্টার্ন বাইপাসের ওপর বোমাফাটার মতো শব্দে পেছনের টায়ারটা ফাটল। পেছনের সিটে জানলা দিয়ে মাথা বের করে বসে থাকা ব্ল্যাকি এত জোর চমকাল যে, জানলার ওপরের লোহায় মাথা ঠুকে গেল ওর। তারপর পেছনের ডানদিকের চাকাটা একটু নিচু হয়ে রিমে ঘষটাতে ঘষটাতে চলল। রাস্তার বাঁ দিক চেপে গাড়ি দাঁড় করাল ছোট্কা।

রাস্তার ডানদিকে এবড়ো-খেবড়ো ধানমাঠ-বোজানো জমি। কোথাও হাঁটুজল ছলছল করছে শরতের পড়ন্ত রোদ্দুরে, কোথাও কোমরসমান দলঘাস আর ঝাঁঝি। বাঁ দিকে সদ্য-গজানো শহরের আবছায়া। নতুন ঝাঁ-চকচকে সব বাহারি বাড়ি। শতকরা পঞ্চাশটি অসমাপ্ত। মাঝে-মাঝে নতুন ইঁটের পাঁজা, বালির ঢিপি।

একটা সদ্য-ঢালাই-হওয়া ছাদের পাটাতন খোলা হয়নি। ভারা বাঁধা। লোহার ছড় বেরিয়ে থাকা কংক্রিটের কার্নিশে সার্কাসের জন্তুর কায়দায় একটা ছাগল ব্যালান্স দেখিয়ে ঘুরছে। শুধু ঘুরছেই না, মাঝে-মাঝে সামনের দু'পা তুলে কার্নিশে ঝুঁকে পড়া পাশের পেয়ারাগাছের পাতা খাবারও চেষ্টা করছে। পা পিছলোলেই একেবারে একতলায় —পপাত ধরণীতলে।

কস্মিনকালে কেউ কক্ষনো শুনেছে যে, ছাগল দোতলার ন্যাড়া কার্নিশে ঘুরে বেড়ায়! এই প্রায় তেপান্তরের মাঠে সবই সম্ভব।

"ছোট্কা! তিন কিলোমিটারের মধ্যে তো গাড়ির চাকার টিউব সারাবার কোনো দোকান দেখিনি, কী হবে?"

ছোট্কা একটা খুব উঁচু দরের হাসি হাসলেন। "কী আর হবে? স্পেয়ার চাকাটাই লাগানো আছে, চাকা পাল্টানোরও কোনো রাস্তা নেই।"

"অটোমোবাইল অ্যাসোসিয়েশনে ফোন করে গাড়িটা টো করে নিয়ে যাওয়া যায় না?"

"নিশ্চয়ই যায়। তবে ফোনটা করা হবে কোত্থেকে?"

হঠাৎ চমকে গেল বিল্টু। সামনের সদ্য-ঢালাই-হওয়া দোতলা বাড়িটার রেলিং না-লাগানো বারান্দাটা থেকে হাত নেড়ে বুড়ো মাস্টারমশাই ওকে ডাকছেন। বুড়ো মাস্টারমশাই তো চলে গেছেন এলাহাবাদে! তাঁর বড় ছেলের কাছে! ডেকে ঘরে ঢুকে গেলেন মাস্টারমশাই।

পাকা গোলাপখাস আমের মতো মুখ, সাধু সন্ন্যাসীদের মতো বুক পর্যন্ত পাকা দাড়ি নিয়ে, ঝাপসা পড়ন্ত বিকেলে, এই ইস্টার্ন বাইপাসে অচেনা অজানা নতুন বাড়ির বারান্দা থেকে বিল্টুকে ডাকবেনই বা কেন? পরশু দিনই ভোরবেলায় স্বপ্ন দেখেছে, বুড়ো মাস্টারমশাই পুবের খোলা জানলার সামনে বসে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন।

"ছোট্কা!" বুড়ো মাস্টারমশাইয়ের মতো একজন লোক ঐ বারান্দা থেকে হাতছানি দিয়ে আমাদের ডাকলেন।"

"অ্যাঁ! কথাটা শুনেই কীরকম যেন হয়ে গেল ছোটকার মুখ। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বললেন, "শোন্, গত পরশুর আগের দিন মাস্টার-মামা মারা গেছেন। যখন টেলিফোন পেলাম, তখন তোর ধুমজ্বর। তোকে আর জানানো হয়নি।"

বিল্টুর বুকের ভেতরটা একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল। বুড়ো মাস্টারমশাই আর নেই! কেউ আর মাথার কাছে বসে চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলবেন না, 'বিল্টু! তাড়াতাড়ি সেরে ওঠো।'

ব্ল্যাকি হঠাৎ আকাশের দিকে মুখ তুলে উঁ...উঁ...উঁ করে কেঁদে উঠল। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা হচ্ছে। ছোটকা চিন্তিত মুখে গাড়ির পেছনের ডালা তুলে কী যেন করছেন। ঝাপসা আলো-আঁধারিতে বিল্টু আবার দেখল, শালখুঁটির ঠেকা দেওয়া দোতলার অন্ধকার ঘর থেকে ঠুকঠুক করে বুড়ো মাস্টারমশাই বারান্দায় বেরিয়ে হাতছানি দিয়ে ওদের ডেকে আবার ঘরে

ঢুকে গেলেন।

"ছোট্‌কা, ওই যে, আবার বুড়ো মাস্টারমশাই আমাদের ডাকলেন।"

ছোট্‌কা দুম করে গাড়ির পেছনের ডালাটা নামালেন। ফাঁকা বারান্দাটার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন তিনি। ঘরের মধ্যে গাঢ় অন্ধকার। তারপর ঘাড়টা প্রায় নব্বই ডিগ্রি ঘুরিয়ে বিল্টুর মুখটা একবার জরিপ করে বললেন, "জ্বরে জ্বরে তোর মাথাটা একেবারে হাল্কা হয়ে গেছে বে বাচ্চা।"

ছোটকা ছেলেবেলায় খুব আদর করে বিল্টুকে 'বাচ্চা' বলে ডাকতেন। ডাকতেন বুড়ো মাস্টারমশাইও। চমকে বিস্ফারিত চোখে ছোট্‌কার মুখের দিকে তাকাল বিল্টু।

দোতলা বাড়িটার একতলায় আলো জ্বলে উঠল। তার মানে ও বাড়িতে লোক থাকে। দোতলাটা ছায়া-ছায়া অন্ধকার। প্লাস্টার হয়নি। দরজা-জানলায় কাঠের ফ্রেম বসানো। পাল্লা নেই। বিল্টুর হঠাৎ মনে হল, সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে আবার জ্বর আসছে। মুখের ভিতরটা বিস্বাদ, জল কাটছে।

"চল্, ঐ বাড়িটায় গিয়ে দেখি তো ফোন্ আছে কিনা। তোর ভয় করছে নাকি? দেখিস, আবার বাড়ি গিয়ে কিছু বলিস না। তোর ঠামাও কিন্তু খবরটা জানে না। হার্টের অবস্থা ভাল নয়।"

বিল্টু ঢোঁক গিলল। সে স্থিরনিশ্চিত ভাবে বুঝতে পারল যে, জ্বর আসছে। এবং ভালভাবেই আসছে।

আলো-জ্বলা জানলার পাশের দরজাটায় কোনো কড়া নেই। কলিং বেলও নেই। তাই হুড়কো খট্ খট্ করল ছোটকা।

"ক্যে?"

"আজ্ঞে; আমরা।"

"কে তোমরা? জানলার সামনে এসে দাঁড়াও দেখি। মুখগুলো দেখি একবার। চার-চারটে পুজোর চাঁদা দিয়েছি। আর দেব না। পাড়া কোথায় তার ঠিক নেই, সক্কলে বলে পাড়ার ছেলে।"

ঘরের মধ্যে মহিলা-কণ্ঠের গজগজানি। ছোট্‌কা আমতা-আমতা করে বললেন, "মানে চাঁদটাঁদা নয়..."

"আগে মুখখানা তো দেখি, জানলার সামনে এসে দাঁড়াও।"

ছোটকা আর বিল্টু যখন জানালার সামনে, তখন বিল্টুর জ্বরের কাঁপুনি শুরু হয়েছে। দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে। জানলার ফাঁকে, ঘরের ভেতরে যাঁকে দেখা গেল, তিনি বেশ শক্তপোক্ত জাঁদরেল এক বৃদ্ধা।

"কে তোমরা?"

"আজ্ঞে, আমাদের গাড়িটা খারাপ হয়েছে..."

"আমি গাড়ির মিস্তিরি নই..."

বলেই সরে যাচ্ছিলেন মহিলা। ছোটকা আবার চেঁচালেন, "শুনুন, শুনুন! আপনাদের টেলিফোন আছে?"

"কোত্থেকে খবর পেলে, বাছা? গতকালই তো কানেকশন দিয়েছে। আরে, এ কী, তুমি পেছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিরগি-রুগির মতো কাঁপছ কেন? ধরো! ও খোকা, ছেলেটা পড়ে যাবে যে!"

এই প্রবল জ্বর আসার সময়েও কাঁপতে-কাঁপতে হাসি পেল বিল্টুর, 'ছোটকাকে' ঐ ঠামার মতো ভদ্রমহিলা 'খোকা' বলে ডাকায়।

ছোটকা খপ্ করে ওকে জড়িয়ে ধরে ফেললেন। নয়তো পড়েই যেত বিল্টু।

"ওর হয়েছেটা কী, বাছা?"

"আজ্ঞে, ম্যালেরিয়া।"

"শুইয়ে দাও, বাপু। একটু ধরে দাঁড়াও..."

খট্ করে দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালেন মহিলা। "এসো, এসো, এদিক দিয়ে এসো, ঐ সোফাটায় শুইয়ে দাও দিকি। এখানে মশার যা উৎপাত। তাণ্ডব চলছে একেবারে। সন্ধে থেকে দরজা-জানলা বন্ধ করে ভূতের মতো বসে থাকতে হয়। অনর্গল কানের কাছে প্যাঁ-পোঁ করছে। দাঁড়াও বাপু! আমার কাছেও দু'একটা বড়ি-টড়ি থাকতে পারে।"

ঠিক ঠামার মতোই রাগ-রাগ সুরে অথচ ভালবাসার গলায় মহিলা জল ওষুধ আর গায়ে চাপা দেবার কম্বল এনে দিলেন। বিল্টু ওষুধ খেয়ে জ্বরে হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে তাঁর একটানা বলা কথা শুনতে লাগল। "দ্যাখো দিকিনি, এ-পাড়া একেবারে নিঝুমপুরী। বৌমা গেছেন বাপের বাড়ি। আমার ছেলের ফিরতে ফিরতে সেই সাড়ে আটটা ন'টা। ডাক্তার-ফাক্তার এখনও এই তেপান্তরে বাসা বাঁধেনি।"

ছোটকা একবার গলা-খাঁকারি দিয়ে বললেন, "মাসিমা, আপনাদের দোতলায় ভাড়াটে আছে বুঝি?"

"বালাই ষাট। ভাড়াটে আবার কোত্থেকে পেলে বাছা—

জেনে নাও

মেঘ হয় কেমন করে

আকাশে তো কত সময়ে মেঘ করে। কত রকমের মেঘ বলে তা আর শেষ করা যায় না। সারা আকাশ জুড়ে সে-সব মেঘ ভেসে বেড়ায়।

এই সব মেঘ হয় কেমন করে?

সব মেঘই জলকণায় তৈরি।

সমুদ্র, নদী, হ্রদ, পুষ্করিণীর উপরিতল থেকে অনবরত জলীয় বাষ্পের সৃষ্টি হচ্ছে। জলীয় বাষ্প বাতাসকে আর্দ্র করে তোলে।

এই বাতাস যখন গরম হয়, তখন সে হালকা হয়ে পড়ে। হালকা বাতাস উপরে ওঠে। আর যত সে উপরে ওঠে, ততই সে ঠাণ্ডা হতে থাকে। বাতাস যে ঠাণ্ডা হয়, তারও একটা হিসেব আছে। তিনশো ফিটে এক ডিগ্রি ফারেনহাইটের মতো। তাহলে উপরে উঠতে উঠতে বাতাস এক সময়ে নিশ্চয়ই খুব বেশি ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। ঠাণ্ডা হয়ে সে জলবিন্দুতে পরিণত হতে চাইবে। তাই তার একটা অবলম্বন চাই। সে অবলম্বন হল বস্তুকণা।

বাতাসে অজস্র ধূলিকণা ভেসে বেড়াচ্ছে। জলীয় বাষ্প এই ধূলিকণার উপরে ঘন হয়ে জলবিন্দুর আকারে ভাসতে থাকে। আর তার ফলেই আকাশে মেঘ দেখা দেয়।

আলোয় ভাল ঘুম হয় না কেন

ঘরে আলো জ্বালা থাকলে ভাল ঘুম হতে চায় না। আলো নিবিয়ে দিলে ঘুম আসে সহজে।

চোখে আলো পড়লে ঘুম আসতে চায় না কেন?

আলো চোখে পড়লে আমাদের স্নায়ুতন্ত্রের কোনো-কোনো অংশ উত্তেজিত হয়ে ওঠে। আমাদের জাগিয়ে রাখে স্নায়ুতন্ত্রের যে-সব অংশ, সেগুলো যদি সক্রিয় থাকে তাহলেই ঘুমের ব্যাঘাত, তখন আর ঘুম আসতে চায় না। আর সেই সব স্নায়ুতন্ত্র যদি কিছুটা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে, তাহলে সহজে ঘুম নেমে আসে আমাদের চোখের পাতায়। আমরা ঘুমের মধ্যে ডুবে যাই।

অরূপরতন ভট্টাচার্য

ওপরের ছাতের ঢালাই এখনও খোলা হয়নি!"

"না···মানে, একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক···ওপরে···"

"এই দ্যাখো কাণ্ড! তোমার মাথার রোগ-টোগ নেই তো?"

ছোটকা ঢোঁক গিলে চুপ করে গেল। বিল্টুর তখন ঘোর লাগা অবস্থা। সোফার পাশে জ্বলজ্বলে চোখে ব্ল্যাকি চুপ করে বসে আছে। বৃদ্ধা আবার বললেন, "তোমাদের তিনটির মধ্যে দেখছি, কুকুরটিই সবচেয়ে শান্ত। যাকগে, কাকে ফোনটোন করবে করো।"

বিল্টু জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন অবস্থায় বলল, "কিন্তু বুড়ো মাস্টারমশাই যে আমাকে দোতলা থেকে ডাকলেন!"

বৃদ্ধা বিল্টুর কপালে হাত দিয়ে জ্বর পরীক্ষা করলেন। তারপর বললেন, "আহা! খুব জ্বর। ভুল বকছে, একটু জলপট্টি দিই সোনা···"

বলে বাটি করে জল আর ন্যাকড়া নিয়ে এসে মাথার কাছে বসলেন। ছোটকা বাড়িতে ফোন করার বহু চেষ্টা করেও লাইন পেলেন না।

অটোমোবিল অ্যাসোসিয়েশন থেকে টো করে নিয়ে যাবার গাড়ি আসতে আসতে প্রায় দেড় ঘণ্টা লেগে গেল। বিল্টুর তখন জ্বর ছেড়ে এসেছে! ভদ্রমহিলাকে প্রণাম করে বেরিয়ে বাড়ি ফিরতে-ফিরতে আরও ঘণ্টাখানেক লাগল।

বাইরের ঘরে সকলেই উৎকণ্ঠিত হয়ে বসে ছিল। গাড়ির শব্দে বাবা-মা দুজনেই বাইরে বেরিয়ে এলেন। হিরুদা দরজা খুলে দিল। "কী গো, হেঁটে যাবে, না কোলে করে নিয়ে যাব?"

বিল্টু লজ্জা-লজ্জা মুখে শুধু বলল, "চুপ করো।" বলে হেঁটে বাড়ি ঢুকল।

মা ছোটকাকে বললেন, "বাব্বা! ফোন পেয়ে তো আমি ভয়ে মরি। রোগা ছেলেটা···"

ছোট্‌কা চম্‌কে তাকালেন, "কার ফোন বৌদি?"

"বাঃ, এক ভদ্রলোক ফোন করে আমাদের সব খবর দিলেন। তোমাদের গাড়ি খারাপ হয়েছে···চিন্তার কিছু নেই···বিল্টুর জ্বর এসেছে···"

বিল্টু আর ছোটকা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। ছোট্‌কা ঘষা গলায় বললেন, "ওনার গলাটা কীরকম?"

মা অন্যমনস্কভাবে বিল্টুর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, "গলাটা কাঁপা-কাঁপা, বুড়ো মানুষদের মতো, মানে অনেকটা আমাদের মাস্টারমামার মতো। আমার বেশ একটু আশ্চর্যও লেগেছিল। অবশ্য ফোনে ঠিক বোঝা যায় না।"

বিল্টু আর ছোটকা হতভম্ব। মা আবার বললেন, "যা, ওপরে শুয়ে পড়গে যা।"

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে বারান্দায় পড়ার ঘরের দরজার দিকে তাকিয়েই গা শিরশির করে উঠল বিল্টুর।

আগে, প্রতিদিন বুড়ো মাস্টারমশাই পড়িয়ে ঘর থেকে বেরুলে ব্ল্যাকি সামনের পা দুটো ওঁর বুকের ওপর তুলে দিয়ে যেমন আদর জানাত, তেমনি আজও শূন্যে দু'পা তুলে নেচে নেচে ফাঁকা বারান্দায় কাকে যেন আদর জানাচ্ছে আর কুঁই-কুঁই করছে।

বিল্টু স্তম্ভিত হয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দু' হাত জোড় করে প্রণাম জানাল।

ছবি : দেবাশিস দেব

মানুচির আরও গল্প

প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

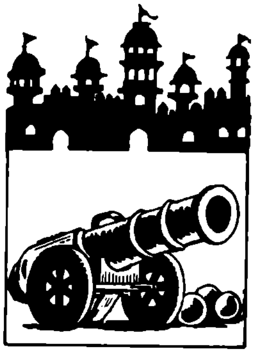

নিকোলাও মানুচির প্রায় চারশো বছর আগে মার্কো পোলো এ-দেশে বেড়াতে এসেছিলেন। তিনিও মানুচির মতো ইটালির লোক, ভেনিসে বাড়ি। তিনি পৃথিবীর অনেক জায়গা ঘুরে দেশে ফিরে গিয়ে তাঁর ভ্রমণকাহিনী লিখেছিলেন। প্রথম প্রথম দেশের লোক তাঁর কথা হেসে উড়িয়ে দিত, কেউ বিশ্বাস করত না। বলত, লোকটা বাহাদুর বটে। এত মজার-মজার আর আজগুবি গল্প বানিয়ে লিখেছে। পরে অবশ্য তাদের এ-ভুল ভেঙেছিল। মানুচিকে এ-রকম কথা অবশ্য কেউ বলেনি। তাঁর লেখা মোগল সাম্রাজ্যের কাহিনী অনেক পরে উইলিয়ম আরভিন চেষ্টা করে বার করেছিলেন। সে উনবিংশ শতাব্দীর কথা। উইলিয়ম আরভিন ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে কাজ করতেন, কিন্তু তাঁর খ্যাতি মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাসকার বলে। মানুচি আওরঙ্গজেবের সময়কার কাহিনী লিখেছেন। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর দশ বছর পরে তিনি মারা যান। অন্য পর্যটকদের মতো তিনি আর দেশে ফিরে যাননি, শেষ জীবন মাদ্রাজে কাটিয়েছিলেন।

মানুচি অনেক পর্যটকের চাইতে সাবধানী লেখক, সাধারণত একটু ভেবেচিন্তে বিবেচনা করে লিখতেন। তিনি তাঁর কালের একজন খুব নামজাদা ফরাসি পর্যটককে পরিহাস করে বলেছিলেন, রাস্তায় শোনা যে-কোনো গল্পগুজবকে বিশ্বাস করে ইতিহাস লেখা উচিত নয়। তাতে অনেক ভুল থাকতে পারে। কিন্তু মানুচির সব কথা বিশ্বাস করা কঠিন। অনেক অদ্ভুত গল্প তিনি নিজেও তাঁর লেখায় ঠাঁই দিয়েছেন। যেমন, ভূতে ধরার গল্প, জাদুকরদের শূন্যে হাত বাড়িয়ে নানারকম ফল নিয়ে আসার গল্প। তাঁর একটি কাহিনীতে আছে যে, তিনি আওরঙ্গজেবের এক বিখ্যাত কর্মচারীর আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছেন। গিয়ে দেখলেন, তাঁর একটি পোষা জাদুকর সেখানে বসে আছে। সে শূন্যে হাত বাড়িয়ে নানারকম ফল এনে দিল। সে-সব ফল সে-অঞ্চলে জন্মায় না। মানুচি কিন্তু এই ফল খেতে রাজি হননি। তাঁর মনে হয়েছিল, কী জানি জাদুর ফল, খেয়ে আবার কী বিপত্তি হবে—সুতরাং খেয়ে কাজ নেই।

মানুচি নিজে অনেক সময় ডাক্তারি করেছেন। তাঁর পসারও ভাল ছিল। কিন্তু তিনি এমন কিছু কিছু ওষুধের কথা লিখেছেন যা এখনকার ডাক্তাররা পরীক্ষা করতে রাজি হবেন না। তাঁর বিশ্বাস ছিল, পাগলা কুকুরে কামড়ালে সমুদ্রযাত্রায় অসুখ সেরে যাবে।

মানুচি শাহজাহানের রাজত্বকালে দু'একটি বিচারের কথা লিখেছেন। এগুলি মানুচির মতে ন্যায়বিচারের এবং বুদ্ধির নিদর্শন। এ-রকম কয়েকটি ঘটনার কথা বলছি। একটি ঘটনা এইরকম। দপ্তরের এক কেরানি নালিশ করেছিল যে, তার একজন পুরনো দাসীকে একজন সৈন্য জোর করে নিয়ে গিয়েছে। দাসীটি বলতে লাগল যে, সে কেরানিটিকে চেনেই না, কখনও তার বাড়িতে কাজ করেনি। সমস্ত জিনিসটাই মিথ্যা। নীচের আদালত ব্যাপারটি ধরতে না পেরে সম্রাটের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সম্রাট বললেন, "এই কথা! আচ্ছা, দাসীটি এসে কয়েকদিন আমার প্রাসাদে থাকুক।" সম্রাট একদিন লিখতে লিখতে দেখলেন যে দোয়াতের কালি ফুরিয়ে গিয়েছে। দাসীটিকে বললেন, "দ্যাখো তো নতুন কালি বানাতে পারো কি না।" সে-আমলে কেরানিরা লেখার কালি নিজেরাই বাড়িতে তৈরি করে নিত। মেয়েটি খুব সুন্দর করে দোয়াতে নতুন কালি বানিয়ে দিল। সম্রাট দেখে বললেন, "তবে রে মিথ্যেবাদী, তুই নিশ্চয় কেরানিটির বাড়িতে কাজ করতিস, নাহলে এ-রকম কালি বানাতে শিখলি কী করে?" আদালতকে হুকুম দেওয়া হল যে, দাসীটিকে কেরানির বাড়িতেই পাঠানো হোক, আর সৈনিকটিকে যেন এখনই কাজ থেকে বরখাস্ত করা হয়।

আর একটি গল্প বলছি। চার সওদাগর মিলে এক দোকান খুলেছিল। প্রত্যেকেরই দোকানের সমান ভাগ। ঠিক হল তারা পালা করে দোকানে বসবে আর সেদিনকার দোকানের তেলের খরচ দেবে। দোকানে একটি পোষা বেড়াল ছিল, তার দুধের খরচও জোগাবে। বেড়ালটি যদি মরে যায় তাহলে সেদিন যে দোকানে থাকবে তাকে নতুন বেড়াল কেনার খরচ দিতে হবে। একদিন দেখা গেল বেড়ালটির একটা পা ভেঙে গিয়েছে। সেদিন যার পালা সেই সওদাগর বেড়ালের চিকিৎসার ব্যবস্থা করল। তার ভাঙা পা মলম দিয়ে বেঁধে রাখা হল। অন্য তিনজন সওদাগরকে বলা হল যে, বেড়ালের চিকিৎসার জন্য যে খরচ হচ্ছে তার জন্য তাদেরও ভাগের টাকা দেওয়া উচিত। তারা বলল যে, এ হতেই পারে না। অন্য সওদাগররা নালিশ করল যে, যেদিন বেড়ালের পা ভাঙে সেদিন যার পালা ছিল তাকেই খরচ দিতে হবে। ইতিমধ্যে বেড়ালটি ভাঙা পা নিয়ে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে প্রদীপের কাছে বসেছে। প্রদীপের আগুন থেকে তার খোঁড়া পায়ের ব্যাণ্ডেজে আগুন লেগে গেল। ভয় পেয়ে ছুটোছুটি করতে করতে বেড়ালটি দোকানের জিনিসপত্রের মধ্যে ঢুকে পড়ল। ফলে আগুন ছড়িয়ে পড়ল আর দোকানটি দেখতে দেখতে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। আদালতে এ নিয়ে মামলা হল কিন্তু ফয়সালা করা গেল না। মামলাটি শেষপর্যন্ত সম্রাট শাহজাহানের কাছে পাঠানো হল। সম্রাট কাগজপত্র দেখে রায় দিলেন যে, যেদিন বেড়ালটি খোঁড়া হয় সেদিন দোকানে যে ছিল তার কোনো দোষ নেই, বাকি তিনজনকে সমস্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যার পালার দিন বেড়ালটির পা খোঁড়া হয়েছিল তার কোনো অপরাধ নেই। সে তো বেড়ালটির চিকিৎসাই করছে। আর খোঁড়া পায়ের ওপর ভর দিয়ে বেড়ালটি লাফালাফি করতে পারে না। যে তিনটি পা ভাল ছিল সেই তিন পা দিয়েই সে

সুপার রিন
আপনাকে যোগায় বাড়তি শুভ্রতা
যা আর কোন ডিটারজেন্ট ট্যাবলেটের সাধ্য নেই।

সুপার রিন-এর দিকে আর একটু লক্ষ্য ক'রে দেখুন।
চমৎকার নতুন মোড়ক—আর, আহ্, অপূর্ব এক নতুন সুগন্ধ!

সুপার রিন-এর শুভ্রতার দিকে আর একটু লক্ষ্য করে দেখুন।
সুপার রিন শুভ্রতার শক্তির ভরপুর এক ভাণ্ডার। এ আপনাকে যোগায় বাড়তি শুভ্রতা, যা আর কোন ডিটারজেন্ট ট্যাবলেটের সাধ্য নেই। আপনি নিজেই দেখুন না— সুপার রিনে কাচা জামাকাপড় এমন ধবধবে সাদা হয় যে সবার মাঝে লোকের নজর কেড়ে নেয়।

হিন্দুস্থান লিভারের উৎকৃষ্ট উৎপাদন

LINTAS RIN 69 2416 BG

লাফিয়েছে। কাজেই ক্ষতিপূরণ অন্য তিনজন সওদাগরকেই দিতে হবে।

আরও একটি গল্প বলছি। এই ধরনের গল্প পরে একাধিক জায়গায় প্রচলিত হয়েছে। কাজেই সবার কাছে নতুন মনে নাও হতে পারে। সবাই জানেন যে, সম্রাট শাহজাহান খুব নাচগানের ভক্ত ছিলেন। হয়তো একটু বেশিই ছিলেন। তাঁর সভায় গুণীদের খুব আদর ছিল। মানুচির কথা ঠিক হলে বিশ্বাস করতে হয় যে, গাইয়ে-বাজিয়েদের মধ্যে যাঁরা একটু ভাঁড়ামি করতে পারতেন তাঁদের কদরই বেশি ছিল। যাঁরা সভায় গাইতে কি বাজাতে আসতেন তাঁদের কাছ থেকে দেউড়ির পঁচিশজন সেপাই নিয়মিত বকশিশ চাইত। নইলে ঢুকতে দেবে না বলে ভয় দেখাত। একদিন এক ওস্তাদ এলেন। ওস্তাদকে ঢুকবার সময় সেপাইরা খুব বাধা দিল! তিনি বললেন, "আচ্ছা বাবাসকল, যা পাই ফেরবার সময় তোদের ভাগ করে দিয়ে যাব।"

ওস্তাদের গানে শাহজাহানের মন ভিজে গেল। তিনি বললেন, "ওস্তাদজি, আমি খুব খুশি হয়েছি। কী চাই বলুন?"

ওস্তাদ বললেন, "যদি খুশি হয়ে থাকেন তাহলে আমার একটি প্রার্থনা আছে।"

সম্রাট বললেন, "কী, বলুন?"

ওস্তাদ উত্তর দিলেন, "একহাজার কোড়ার ঘা।"

সম্রাট বললেন, "সে কী কথা! এরকম পুরস্কার চাইছেন কেন?"

ওস্তাদ উত্তর দিলেন, "না চেয়ে উপায় কী? প্রত্যেকদিন এখানে ঢুকবার সময় আপনার সেপাইরা জ্বালাতন করে। বলে, বকশিশ না পেলে ঢুকতে দেব না। আজ বলে এসেছি, যা পাব তোদের সব দেব।" শাহজাহান শুনে একটু হাসলেন। বললেন, "তাই হোক।" তারপর সেই পঁচিশজন সেপাইকে ডেকে এক হাজার কোড়ার ঘা তাদের ভাগ করে দেওয়া হল। ওস্তাদজিকে শুধু হাতে ফিরে যেতে হয়নি। তিনি সম্রাটের কাছ থেকে এক হাজার আশরফি পেলেন তাঁর গানের জন্যে, আর একটি ঘোড়া তাঁর বুদ্ধির জন্যে।

সম্রাট হবার পর আওরঙ্গজেবের খুব শখ হয়েছিল যে, তিনি একটি নৌবাহিনী তৈরি করবেন। দিল্লি বা আগ্রা যদি সমুদ্রের খুব কাছে হত তাহলে নৌবাহিনী আপনা থেকেই তৈরি হয়ে যেত, যেমন ইউরোপে ইংরেজ, ফরাসি ও পর্তুগিজদের দেশে। আমাদের দেশের লোকদের বড় নৌবাহিনী ছিল না। একমাত্র বোম্বাইয়ের কাছে জঞ্জিরা দ্বীপে আবিসিনিয়ানদের যুদ্ধজাহাজ ছিল। কাছেই শিবাজির রাজ্য। শিবাজি নিজের নৌবাহিনী তৈরি করেছিলেন এইসব আবিসিনিয়ানদের সাহায্যে। তাঁরা বড় নৌকর্মচারীর পদ পেতেন। শিবাজি তাঁর নৌবাহিনীতে পর্তুগিজদেরও নিতেন। আওরঙ্গজেবের এ-রকম নৌবাহিনী তৈরি করা সম্ভব ছিল না। জঞ্জিরা তাঁর সাম্রাজ্য থেকে অনেক দূরে। পর্তুগিজরা তাঁর শত্রু। কাছাকাছি সমুদ্র না থাকলে নৌবাহিনী কোথায় যুদ্ধ করবে? তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা হল যে, নৌবাহিনীর কাজ ভারতীয়দের দিয়ে ভাল হবে না, বিদেশীদের রাখতে হবে। সেটা কি উচিত? আওরঙ্গজেবও কম জেদি ছিলেন না, তিনি রাজি হলেন না। অবশেষে একটি ছোট জাহাজ তৈরি করে একটি দিঘিতে ভাসানো হল। তাতে কামান ও অন্যান্য যুদ্ধের সরঞ্জাম বসানো ছিল। আওরঙ্গজেব দেখতে লাগলেন কী করে জাহাজটি চালানো হচ্ছে। জাহাজটি সহজে এদিক-ওদিক ঘুরছিল। জাহাজ থেকে চারদিকে আক্রমণের ব্যবস্থা। তিনি সব দেখেশুনে বললেন, "না বাপু, এ-সব এ-দেশের লোক দিয়ে হবে না। এ-সব ফিরিঙ্গিদেরই মানায়।" মোগল নৌবাহিনীর কথা চাপা পড়ে গেল।

ঐতিহাসিকরা যে মানুচিকে উঁচু স্থান দেন তার প্রধান কারণ কিন্তু এইসব গল্পগাছা নয়। তখনকার মোগল সাম্রাজ্যের ঐতিহাসিক কাহিনী, শাহজাহানের ছেলেদের মধ্যে যুদ্ধ, শাহজাহানের শেষ জীবনের বর্ণনা এবং মোগল দরবারের কথা তিনি যা লিখেছেন তার তুলনা পাওয়া কঠিন। এই সময়কার ইতিহাস জানতে গেলে বারে বারে মানুচির শরণাপন্ন হতে হয়।

ছবি : অনুপ রায়

ক্যালকুলাসের কাণ্ড

গণ্ডার ! ডাইনোসরাস !
আরে, গাড়ির কাচে থুথু ছেটাচ্ছেন কেন ?
সাবান-জলের সুইচ টিপছি !
হল ?
আমাদের বন্ধু ক্যালকুলাস ডাকাতের হাতে বন্দী । আমরা তাদের পিছু নিয়েছি। আপনি আমাদের সাহায্য করবেন ?
ডাকাত ? ... নিশ্চয় । ... উঠে পড়ুন !
লাগেনি তো ?
না ।
SLAM
হুড়ুড়ুড়ুড়ুম্
দড়াম ।
বাবা রে ! স্টার্ট দিয়েই কেউ এত জোরে গাড়ি চালায় ?
হাহা !
ইতালির গাড়ি, ইতালির ড্রাইভার ! হুঁহুঁ বাবা, ডাকাতদের আজ আর নিস্তার নেই !
ক্যালকুলাস আসলে এমন একটা জিনিস উদ্ভাবন করেছেন, যেটাকে হাতাবার জন্যেই বিদেশী গুপ্তচরেরা তাঁকে ধরে নিয়ে গেছল !
কিন্তু তাদের বিরোধী পক্ষের লোকরা ... তাদের হাত থেকে ক্যালকুলাসকে ছিনিয়ে নিয়েছে !
হিচ-হাইকার ! এদের বিরুদ্ধে আইন হওয়া উচিত !
আচ্ছা, গাড়িটা একটু আস্তে চালালে হয় না ?
আলকাতরা সাবধান
!
আরে, খট্‌খট্ করে শব্দ হচ্ছে কিসের ?
খট্ খট্ খট্ খট্ খট্ খট্ খট্

টিনটিন

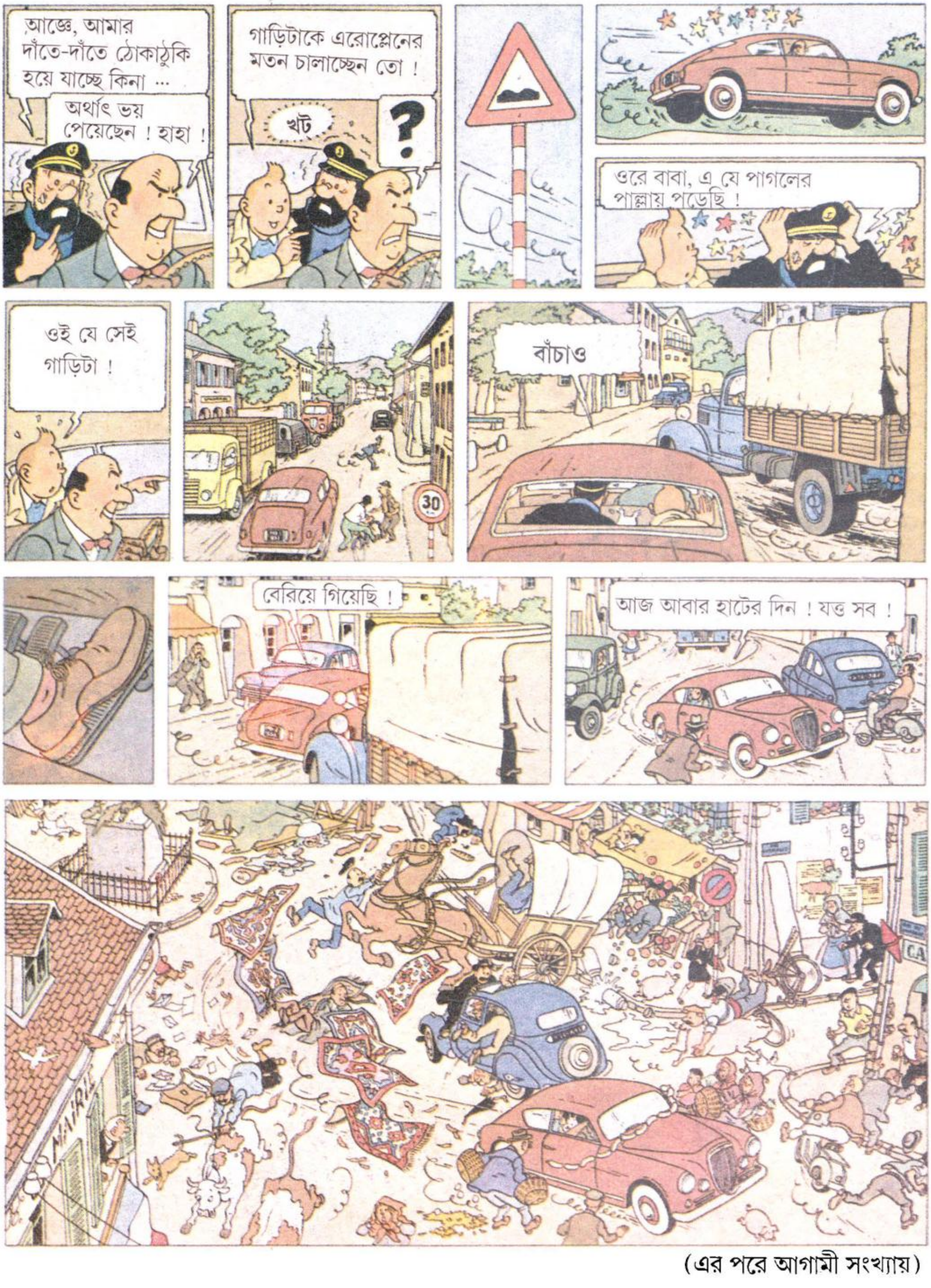

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

পেনাল্টি

গ্যালারীতে ছিলেন দাদু, যেন ভিজে বেড়ালটি
হঠাৎ দারুণ লাফিয়ে উঠে হেঁকে বলেন, পেনাল্টি
অমনি এমন কান্ড বাধায় ছোকরারা সব তুলকালাম
রেফারিটি বাজিয়ে বাঁশী বলেন, বাবা, থামরে থাম।
খেলা এখন শেষের পথে, বল রয়েছে মাঝ মাঠেই
কোন আক্কেলে বল্‌তো দাদা পেনাল্‌টি কিক্ মারতে দেই?
সবাই তখন ঘাবড়ে গেল, সত্যিই তো ঠিক কথাই
ফাউল টাউল কিচ্ছুটি নেই, ওঠে না এ প্রশ্নটাই।
বাগিয়ে ছাতা, লাফিয়ে দাদু, রেগে ভোলেন দিগ্বিদিক,
বুদ্ধু যত, নিচ্ছ মেনে? ভাবছ মনে এটাই ঠিক?
দেখলে না ঐ সূয্যি ব্যাটা করলে ফাউল অবিশ্রাম!
আহা কচি প্লেয়ারগুলোর দরদরিয়ে ঝরলো ঘাম!
হিসেব করে দেখলে কি কেউ এনার্জি ক্ষয় ক'বাল্‌টি
শুক্‌নো ত্বক আর ঝলসানো মুখ, তবুও কি নয় পেনাল্‌টি?
এই না বলে দাদু 'ফায়ার', বের করেন এক সবুজ টিউব
হাতে মুখে লাগা তোরা, বুড়ো হলেও নই বেকুব!
রোদের ক্ষতি পূরণ হবে, জিতবেই ঠিক আসছে দিন
ছেলেখেলা নয়কো বাবা! এর নাম হুঁ বোরোলীন!

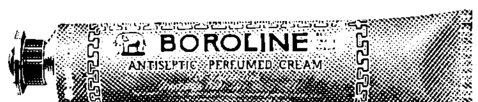

কাটা-ছড়া ও ত্বকের সুরক্ষার জন্য

বোরোলীন

সুরভিত | অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম

জি ডি ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড
আশা মহল, নিউ আলিপুর, কলকাতা ৭০০ ০৮৮

GDP-5241

কালো পর্দার ওদিকে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : দিপু আর তার দিদি ইরানি এসেছে বর্ধমানের একটি গ্রামে। ওদের জ্যাঠামশাই চাকরি থেকে রিটায়ার করে এই গ্রামে এসে অনেক রকম বাগান করেছিলেন, কিন্তু কয়েকদিন ধরে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। রাত্তিরবেলা তিনি একা-একা লেবুবাগানে গিয়েছিলেন, তারপর থেকে তিনি উধাও। এখানকার লোকজনদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে কিছুই বোঝা গেল না। দিপু তার দিদিকে কিছু না জানিয়ে মাঝরাতে পুকুরধারে এসে একজন রহস্যময় লোকের দেখা পেল, তারপর আর দিপু ফিরে এল না। এদিকে দিপু-ইরানির কোনো খবর না পেয়ে কলকাতায় ওদের বাবা-মা খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। দিপুর বাবা অসুস্থ, তবু সেই অবস্থাতেই তিনি ওদের খোঁজে বেরিয়ে পড়তে চান। তারপর...

পরিতোষ ডাক্তারের এক ঘণ্টার মধ্যে খবর দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু দেড় ঘণ্টা কেটে গেল, তবু তাঁর কাছ থেকে কোনো খবর এল না। বাবা উতলা হয়ে রঘুকে পাঠালেন ওঁর চেম্বারে। রঘু ফিরে এসে খবর দিল, ডাক্তারখানা বন্ধ। ডাক্তারবাবুর গাড়িও সেখানে নেই।

বাবা রীতিমতন অবাক হয়ে গেলেন। কোনো জরুরি কল্ পেয়ে চলে যেতে হল পরিতোষ ডাক্তারকে ? কিন্তু চেম্বার তো কাছেই, যাবার আগে সে-কথা জানিয়ে যেতে পারতেন নিশ্চয়ই। পুলিশের সাহায্য নিয়ে ওয়্যারলেসে খবর আনাবার কথা ছিল, তারও যে কী হল তা বোঝা গেল না। বাবা ঘন-ঘন ঘড়ি দেখছেন আর রাস্তার ধারের জানলায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন।

মায়ের মুখখানা আরও ঘুঁচিমুচি হয়ে গেছে। মায়েরা সব সময় বেশি বিপদের কথা চিন্তা করেন তো !

মা ঘরে ঢুকে বললেন, "তা হলে পুলিশের কাছ থেকে নিশ্চয়ই কিছু খারাপ খবর এসেছে ! না হলে উনি এলেন না কেন ?"

বাবা বললেন, "তুমি বেশি ব্যস্ত হয়ো না। পরিতোষ ঠিকই আসবে !"

বলতে-বলতেই বাবা ছুটে গেলেন বারান্দায়, রাস্তায় একটা গাড়ি থামার শব্দ হল। কিন্তু সেটা ট্যাক্সি, পাশের বাড়িতে কেউ এসেছে।

এরও আধঘণ্টা বাদে এল একটা পুলিশের গাড়ি। সেই গাড়ি থেকে নামলেন পরিতোষ ডাক্তার আর একজন অচেনা ভদ্রলোক। তিনি পরে আছেন সাধারণ প্যান্ট-শার্ট, দেখলে পুলিশ বলে মনেই হয় না।

ওপরে এসে পরিতোষ ডাক্তার আলাপ করিয়ে দিলেন, "ইনি হচ্ছেন রমেন সরকার, ডি·আই·জি·, ক্রাইম। আমার দেরির জন্য চিন্তা করছিলে তো ? জানোই তো টেলিফোনের কী অবস্থা, কিছুতেই লালবাজারের কানেকশান পাচ্ছিলুম না, তাই নিজেই চলে গেলুম লালবাজারে। সেখান থেকে অনেক চেষ্টা করা হল মেমারি থানাকে ধরার..."

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "কিছু খবর পাওয়া গেল ?"

রমেন সরকার বললেন, "মেমারি থানাকে পেয়েছি। কিন্তু ওখান থেকে আপনার গ্রাম, ঐ যে কী নাম যেন, ঘোড়াডাঙা, সেখানকার থানাটা আর কিছুতেই ধরা যাচ্ছে না। বোধ হয় ওদের যন্ত্রটা খারাপ। মেমারি থানা থেকে ওদিককার খবর বিশেষ কিছু বলতে পারল না, তবে ঘোড়াডাঙার দিকে নাকি আজ দুপুরের দিকে খুব ঝড় হয়েছে, অনেকগুলো বাড়ি ভেঙে পড়ে গেছে।"

বাবা বললেন, "নভেম্বর মাসে ঝড় ?"

রমেন সরকার বললেন, "তাই তো শুনলাম !"

বাবা বললেন, "ওদের যখন খবর পাওয়া গেল না, তা হলে তো যেতেই হয় ! আর দেরি করার কোনো মানে হয় না ! পরিতোষ, তুমি তা হলে কী ঠিক করলে ?"

ডাক্তার বললেন, "শোনো অরুণ, সব ঘটনাটা আমি রমেনবাবুকে বলেছি। ইনি কী পরামর্শ দিচ্ছেন শোনো !"

রমেন সরকার বললেন, "ঘটনাটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। একজন বয়স্ক লোক নিরুদ্দেশ হয়ে যাবেন কেন ? তারপর আপনার ছেলেমেয়েদের পাঠালেন, ওদের পাঠাবার আগে একবার আমাদের খবর দেওয়া উচিত ছিল। জানেন তো, আজকাল প্রায়ই ট্রেনে ডাকাতি হয় ? আপনার ছেলেমেয়েরা যে-সময়ে গেছে, প্রায় সেই সময়েই সেদিন বর্ধমান লাইনে একটা ট্রেনে ডাকাতির চেষ্টা হয়েছিল।"

বাবা বললেন, "অ্যাঁ ? ট্রেনে ডাকাতি ? ওরা নির্ঘাত ডাকাতের পাল্লায় পড়েছে, শেষ পর্যন্ত ঘোড়াডাঙায় পৌঁছতেই পারেনি !"

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মা সব কথা শুনছিলেন। তিনি বললেন, "তুমি সব ভুলে গেলে নাকি ? রঘু ওদের সঙ্গে গিয়েছিল না ? রঘু তো গ্রাম পর্যন্তই ওদের সঙ্গে গিয়েছিল।"

বাবা বললেন, "ও হ্যাঁ, তাই তো ! রঘু কি ট্রেন-ডাকাতির কথা বলেছিল ?"

মা বললেন, "হ্যাঁ, বলেছিল। বিশ্বাস করিনি। ও যা বানিয়ে বানিয়ে অদ্ভুত কথা বলে !"

রমেন সরকার বললেন, "আপনারা আজ রাত্তিরেই যাওয়ার কথা ভাবছিলেন তো ? আমার মতে, আপনাদের সবার যাবার দরকার নেই। তা ছাড়া, আপনি এখনও পুরোপুরি সুস্থ হননি। আমাকে বিশেষ কাজে বর্ধমানে যেতে হবে আজ রাত্তিরেই। সাড়ে দশটার সময় রওনা দেব। আমার জিপেই আপনারা একজন কেউ যেতে পারেন, কেউ না গেলেও অবশ্য চলে। আমি নিজে গিয়ে আপনাদের ছেলে-মেয়ের খোঁজ নিয়ে আসব !"

ডাক্তার বললেন, "এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আর হতে পারে না। রমেনবাবু নিজেই যখন যাবেন বলছেন !"

বাবা বললেন, "তাহলে আমিই যাচ্ছি। আমি তৈরিই আছি, এক্ষুনি বেরুতে পারি।"

রমেন সরকার বললেন, "আপনিই যাবেন ?"

ডাক্তার বললেন, "অরুণ, তোমার তো আর এক্ষুনি যাবার দরকার নেই। রমেনবাবু নিজেই যাচ্ছেন যখন। তোমার পা-টা এখনও পুরোপুরি ঠিক হয়নি।"

বাবা বললেন, "আমি যাব একেবারে ঠিক করে ফেলেছি। রমেনবাবু যদি সঙ্গে নিতে না চান, তা হলেও আমাকে যেতে হবে।"

এক মিনিট ঘরের সবাই চুপ করে গেল।

তারপর ডাক্তার বললেন, "ঠিক আছে, চলো, তোমার সঙ্গে আমিও যাব। রমেনবাবু, আপনার গাড়িতে দু'জনের জায়গা হবে নিশ্চয়ই ?"

রমেনবাবু মাথা নাড়লেন।

ডাক্তার দিপুর মায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, "বৌদি, তোমার আর যাওয়া হল না। তুমি আজ রাত্তিরটা না-ঘুমিয়েই কাটিয়ে দাও। কাল দুপুরের মধ্যেই ভাল খবর পেয়ে যাবে।"

তৈরি-টৈরি হয়ে নিতে খানিকটা সময় লাগল। জিপটা স্টার্ট করল রাত পৌনে এগারোটায়।

এই সময় রাস্তা ফাঁকা। জিপে রমেনবাবুর একজন দেহরক্ষীও রয়েছে। গাড়িটা ছুটছে খুব জোরে আর হুহু করে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। পরিষ্কার আকাশে অসংখ্য তারা।

বাবা বললেন, "এখানে এ-রকম আকাশ, আর বর্ধমানে ঝড়বৃষ্টি হয় কী করে ?"

ডাক্তার বললেন, "আজকাল আবহাওয়ার কোনো মাথামুণ্ডু নেই। গরমকালে বৃষ্টি হয় না, শীতকালে বৃষ্টি।"

রমেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা অরুণবাবু, আপনার দাদা, যিনি বর্ধমানের ঐ গ্রামে গিয়ে চাষবাস করছিলেন, তিনি লাস্ট কবে কলকাতায় এসেছিলেন ?"

বাবা একটু ভেবে বললেন, "তা প্রায় বছরখানেক হবে। আসল কথা কী জানেন, আমার দাদা কলকাতায় আসতেই চাইতেন না। গ্রামটা এত ভাল লেগে গিয়েছিল যে, তিনি ওখানেই শান্তিতে থাকতেন। দাদা বলতেন, কলকাতার রাস্তায় এত গর্ত, বাতাসে এত ধোঁয়া, এর মধ্যে তোরা থাকিস কী করে ?"

ডাক্তার বললেন, "আমি আবার গ্রাম-ট্রামে গিয়ে দু'তিন দিনের বেশি টিঁকতে পারি না। যতই টাটকা হাওয়া থাক আর পাখি-টাখি ডাকুক, সন্ধের পর আর কিছুই করার থাকে না।"

রমেনবাবু বললেন, "আপনার দাদা এই যে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন, এটা শুনে আমার অন্য একটা ঘটনা মনে পড়ছে। সেটাও এই বর্ধমানের দিকেরই ঘটনা।"

ডাক্তার বললেন, "কী শুনি ঘটনাটা ?"

রমেনবাবু বললেন, "গ্রামের নামটা আমি এখন ঠিক মনে করতে পারছি না। সেই গ্রামে একটা বেশ বড় স্কুল আছে। পুরনো স্কুল, এক সময় খুব নামডাক ছিল, তারপর অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। স্কুলটা উঠে যাবারই প্রায় উপক্রম হয়েছিল, এই সময় সেখানে একজন নতুন হেডমাস্টার এলেন। ভদ্রলোকের বয়েস খুব বেশি নয়, বছর-চল্লিশেক হবে, স্বাস্থ্য খুব ভাল। ছেলেদের সঙ্গে তিনি ফুটবলও খেলতেন। এই হেডমাস্টার ভদ্দরলোক দারুণ পরিশ্রম করে স্কুলটাকে আবার দাঁড় করালেন। লোকের কাছ থেকে চেয়ে-চিন্তে টাকা আদায় করে স্কুল-বিল্ডিংটা সারালেন, ছাত্রদের কাছে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিলেন। সারা বর্ধমানে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছিল। তারপরই একটা অদ্ভুত কাণ্ড হল।"

ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন, "হঠাৎ ভদ্রলোক উধাও হয়ে গেলেন ?"

রমেনবাবু বললেন, "শুনুন না ব্যাপারটা। দিল্লি থেকে প্রতি বছর সারা দেশের ভাল-ভাল শিক্ষকদের জাতীয় পুরস্কার দেওয়া হয় জানেন তো ? বছর পাঁচেক আগের কথা বলছি, তখন আমি বর্ধমানের এস· পি· ছিলাম, সেই বছর ঐ ভদ্রলোক জাতীয় পুরস্কারের জন্য মনোনীত হলেন। কিন্তু সেই চিঠি পাঠাতে গিয়ে দেখা গেল, ভদ্রলোককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি অদৃশ্য হয়ে গেছেন।"

বাবা বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার যেন মনে পড়ছে কাগজে এ-রকম একটা খবর দেখেছিলাম সেই সময়ে। হেডমাস্টারমশাইয়ের নাম নারায়ণ মণ্ডল না ? তাঁকে আর তো খুঁজেই পাওয়া যায়নি শেষ পর্যন্ত ?"

রমেনবাবু বললেন, "আমি নিজে গিয়েছিলুম তদন্ত করতে। আশ্চর্য ব্যাপার মশাই! ভদ্রলোক এত সাকসেসফুল। কাছাকাছি দশ-বিশখানা গ্রামের সব মানুষ তাঁকে ভালবাসে। তিনি এমন কিছু ধনী লোক নন যে, চোর-ডাকাতরা তাঁর ওপর নজর দেবে। তাঁর বাড়িতে সব জিনিস যেমনটি তেমনি পড়ে আছে। দেখলেই মনে হয় যেন ভদ্রলোক উঠে বাথরুমে গেছেন, এক্ষুনি ফিরে আসবেন! ওঁর বাড়িতে রান্না করার যে লোকটি ছিল, সে বলেছিল যে, হেডমাস্টারমশাই সন্ধের পর পাশের বাগানটায় একটু বেড়াতে গিয়েছিলেন, তারপর সেখান থেকে আর ফেরেননি। একেবারে অদৃশ্য!"

বাবা অস্ফুট স্বরে বললেন, "বাগান ? কিসের বাগান ?"

রমেনবাবু বললেন, "এমনি গ্রামের বাগান যে-রকম হয়। কোনোরকম ট্রেসই আর পাওয়া গেল না। গ্রামের কোনো লোক তাঁকে রেল-স্টেশনের দিকে যেতে দেখেনি।"

ডাক্তার বললেন, "আশ্চর্য!"

রমেনবাবু বললেন, "সত্যি আশ্চর্য। তবে এখনও একটু বাকি আছে। সেই হেডমাস্টারের শেষ পর্যন্ত সন্ধান একটা পাওয়া গিয়েছিল, প্রায় তিন বছর বাদে।"

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল ?"

রমেনবাবু বললেন, "হ্যাঁ। হরিদ্বারে। তিনি তখন সাধু। মুখভর্তি দাড়ি, মাথায় বাবরি চুল। ওঁর একজন ছাত্র চিনতে পেরেছিল। ছাত্রটি 'স্যার স্যার' বলে পা জড়িয়ে ধরেছিল। কিন্তু সেই সাধু তখন মৌনীবাবা। হরিদ্বারের কোনো লোক তাঁকে একটাও কথা বলতে শোনেনি। সেই ছাত্রটি তাঁর পা ধরে অনেক কান্নাকাটি করার পর তিনি এক টুকরো কাগজে লিখে দিয়েছিলেন, 'আমি এখন অন্য মানুষ হয়ে গেছি। পুরনো পরিচয়ের কথা তুলে আমাকে আর বিরক্ত কোরো না!' দেখুন দেখি কাণ্ড! তাই ভাবছিলাম, আপনার দাদাও যদি এ-রকম..."

বাবা বললেন, "না, আমার দাদা হঠাৎ সাধু-সন্ন্যাসী হয়ে যাবার মতন মানুষ নন। দাদাকে তো আমি চিনি!" (ক্রমশ)

অর্থ জানো

ধুরন্ধর, পিনাক…

অনেক শব্দ আমরা বাংলা ভাষায় ব্যবহার করি তার মূল অর্থ না জেনেই। শব্দের মূল অর্থ জানা থাকলে শব্দ প্রয়োগে সংশয় ঘটে না বা বিপদে পড়তে হয় না। নীচের শব্দগুলি ঐ শ্রেণীর, আর আমরা তা প্রায়ই ব্যবহার করে থাকি। প্রতিটি শব্দের পাশে কয়েকটি আনুমানিক অর্থ দেওয়া আছে। যেটি ঠিক মনে হবে, তাতে দাগ দেবে। সবশেষে উত্তরের সঙ্গে মেলাবে। শব্দের অর্থও ঠিক জানতে পারবে।

১। **ধুরন্ধর**—(ক) ধড়িবাজ, (খ) যে ওস্তাদ, (গ) যে ভার বহন করে, (ঘ) যে নানা কৌশলে কাজ সারে।

২। **পিনাক**—(ক) শিবের ডমরু, (খ) শিবের ধনুক, (গ) শিবের ত্রিশূল, (ঘ) শিবের হাতের চক্র।

৩। **রবিবাসর**—(ক) রবিবারের গল্পগুজব, (খ) রবিবারের আড্ডা মারার ঘর, (গ) রবিবার, (ঘ) রবিবারের আসর।

৪। **ভূয়োদর্শী**—(ক) যে সংসারে সবকিছু ভুয়া বা মিথ্যা দেখে, (খ) যে মানুষের স্বভাব সহজেই বুঝে নিতে পারে, (গ) যে বহু দেখেছে, (ঘ) যার দেখায় ভুল আছে।

উত্তর : ১। ধুরন্ধর—(গ) যে ধুর অর্থাৎ ভার বহন বা ধারণ করে। সেই অর্থে যে অনায়াসে কর্মভার বহন করতে সক্ষম। যথা—'এই পথ দিয়ে ভীষ্ম গেছেন ভারত-ধুরন্ধর' (কবি সত্যেন্দ্রনাথ)। ব্যঙ্গে এর অর্থ চতুর, ফন্দিবাজ। ২। পিনাক—(খ) শিবের ধনুক। যথা—'পিনাকেতে লাগে টঙ্কার' (রবীন্দ্রনাথ)। শিবের এক নাম পিনাকপাণি। ৩। রবিবাসর—(গ) রবিবার। বাসর শব্দের একটি অর্থ দিবস। যেমন শ্রাদ্ধবাসর, বিবাহবাসর। ৪। ভূয়োদর্শী—(গ) যে বহু দেখেছে অর্থাৎ অভিজ্ঞ। ভূয়ঃ শব্দের অর্থ অধিক। যেমন—বিদ্যাসাগরমশাই ভূয়োদর্শী পুরুষ।

দেব-সেনাপতি

সহজে ইংরেজি

মা-বাবা ছিলেন না

চামেলি আর চম্বল দু'জনেরই পরীক্ষা সামনে, তাই সেদিন সন্ধ্যাবেলা বাবা আর মা যখন এক বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে গেলেন, ওদেরকে বাড়িতেই রেখে গেলেন, পড়াশোনা করবার জন্যে। কিন্তু যা মনে করা যায়, তা কি আর সব সময়ে হয় ? সদর-দরজায় ঘণ্টা বেজে উঠল।

Chambal looked at Chameli and Chameli looked at Chambal. One of them had to get up and open the door. Who was it going to be?

They were not expecting company.

Chambal thought it might be some neighbour.

But when he opened the door they saw Mr. and Mrs. Banerjee with their daughters Tiya and Toompa. They were not neighbours but family friends of very long standing.

"Hullo Milly, Hullo Chambal," Mrs. Banerjee said, "Is everybody at home?"

They appeared a little disappointed to hear that Mr. and Mrs. Roy had gone out.

"But you might still come in," Milly urged, "Perhaps Mummy and Daddy won't be long."

"Most certainly we will," Mr.Banerjee said. "You too can keep us company, I expect."

Tiya, that is, Miss Paramita Banerjee and Toompa, that is, Miss Anindita Banerjee were very good friends of Milly's, though much younger.

খানিকক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল, তিন বন্ধুতে জোর গল্প চলছে, আর অন্য দু'জন অতিথির সঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছে চম্বলের।

Suddenly Milly remembered her duties as the lady of the house in the absence of Mummy.

"I'll make you a nice cup of tea," she declared, getting up from her chair.

But Mrs. Banerjee stopped her.

"I can't let you do that," she said. "You might burn your fingers trying to light the gas."

Mr. Banerjee said, "You might bring me a glass of water, instead."

But Mr. and Mrs. Roy were back home soon and the Banerjees had their tea after all.

এবারে লক্ষ করবার বিষয় এই শব্দটির ব্যবহার :

MIGHT

তোমরা জানো

Might is the past tense of 'may'.

যেমন :

Chambal thought it might be some neighbour.

কিন্তু অনেক সময়ে শব্দটি অন্যভাবেও ব্যবহার করা হয় তখন অনুরোধ বোঝাতে পারে :

"You might come in," urged Milly.

"You might bring me a glass of water."

কিংবা কোনো কিছু হলেও হতে পারে, সম্ভাবনাটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, তাও বোঝাতে পারে, যেমন

"You might burn your fingers."

প্রসাদ

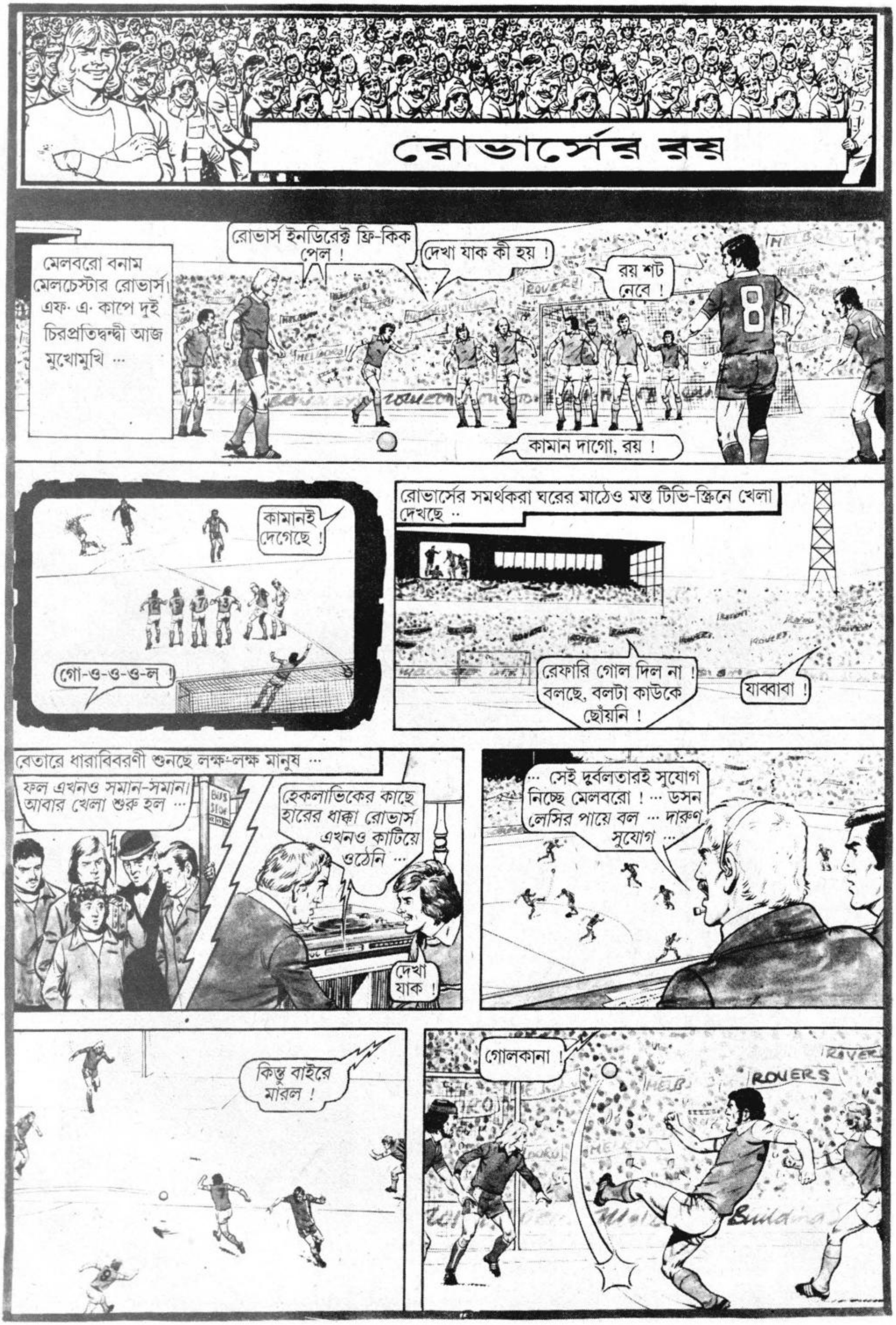

রোভার্সের রয়
মেলবরো বনাম মেলচেস্টার রোভার্স। এফ· এ· কাপে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আজ মুখোমুখি ...
রোভার্স ইনডিরেক্ট ফ্রি-কিক পেল !
দেখা যাক কী হয় !
রয় শট নেবে !
কামান দাগো, রয় !
কামানই দেগেছে !
গো-ও-ও-ও-ল !
রোভার্সের সমর্থকরা ঘরের মাঠেও মস্ত টিভি-স্ক্রিনে খেলা দেখছে ...
রেফারি গোল দিল না ! বলছে, বলটা কাউকে ছোঁয়নি !
যাব্বাবা !
বেতারে ধারাবিবরণী শুনছে লক্ষ-লক্ষ মানুষ ...
ফল এখনও সমান-সমান। আবার খেলা শুরু হল ...
হেকলাভিকের কাছে হারের ধাক্কা রোভার্স এখনও কাটিয়ে ওঠেনি ...
দেখা যাক !
... সেই দুর্বলতারই সুযোগ নিচ্ছে মেলবরো ! ... ডসন লেসির পায়ে বল ... দারুণ সুযোগ ...
কিন্তু বাইরে মারল !
গোলকানা !

মাঠে দারুণ উত্তেজনা ...
লেসির গোল দেওয়া উচিত ছিল ...
বল গোলে গেলেও চার্লি আটকে দিত !
হ্যাঁ, পজিশন ঠিকই নিয়েছিল !
গোল-কিক নেবার মুহূর্তে ...
হাফ-টাইমের বাঁশি !
বাব্বা !
এতক্ষণে একটু হাঁফ ছাড়া যাবে !
কী রয়, হেকলাভিকের কথা ভাবছ ?
জ্যাকসন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিচ্ছে !
আজ তোমাদের নাস্তানাবুদ করে ছাড়ব !
দেখা যাক !
জ্যাকসনটা মহা পাজি !
ব্ল্যাকি গ্রে রাগে ফুঁসছে ....
রয়, এবারে নোয়েল ব্যাক্সটারকে নামালে কেমন হয় ?
হেকলাভিকের সঙ্গে খেলায় নোয়েল ছিল না।
হুম ! কথাটা মন্দ বলোনি !
দাঁড়াও, ভেবে দেখি !
রয় কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছে !
আবার শুরু হল খেলা !
বিল বেনেট বল ধরতে এগোচ্ছে !
কিন্তু রোভার্সের ডিফেন্সও তৈরি !
বেনেট কিন্তু বলটাকে উঁচু করে গোলে পাঠাল ...
ক্রসবারের তলা দিয়ে ঢুকছে !
গো-ও-ও-ও-ল
কী হল রয় ?
রোভার্সকে আরও গোল দেব !
নোয়েলকে না-নামালে সর্বনাশ !
এফ. এ. কাপ থেকেও বিদায় নিতে হবে !
সত্যিই কি রোভার্স আজ গো-হার হারবে ?
(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

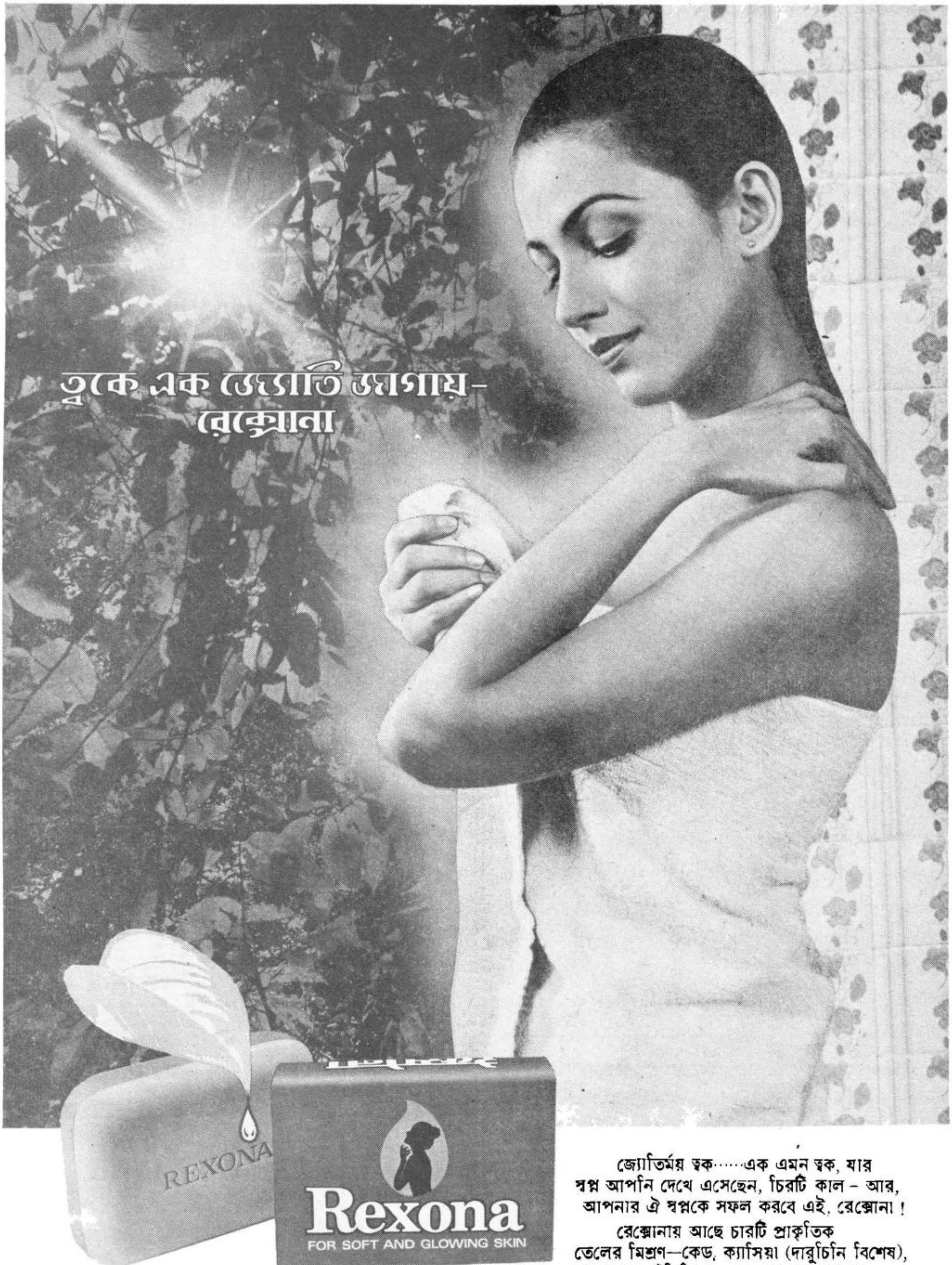

জ্যোতির্ময় ত্বক……এক এমন ত্বক, যার
স্বপ্ন আপনি দেখে এসেছেন, চিরটি কাল – আর,
আপনার ঐ স্বপ্নকে সফল করবে এই, রেক্সোনা !

রেক্সোনায় আছে চারটি প্রাকৃতিক
তেলের মিশ্রণ—কেড, ক্যাসিয়া (দারুচিনি বিশেষ),
লবঙ্গ আর টেরিবিন্থ – যা, আপনার ত্বকের
যত্ন নেয়, স্বাভাবিক উপায়ে।

রেক্সোনা আপনার ত্বক রাখে কোমল ও উজ্জ্বল!

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন।

LINTAS RX 84 2416 BG

‘সোমা, ঘাবড়ে যেও না’

সোমা দত্ত

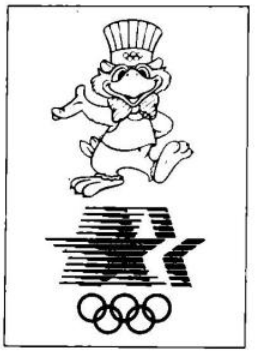

ল্যানির কথা তো তোমাদের আগেই বলেছি। হিমাংশুজেঠু যেদিন আমাদের বাগবাজারের বাড়িতে প্রথম ওঁর কথা বলেন, সেদিন থেকেই ওঁর সম্পর্কে আমার অসীম কৌতূহল। ভাবতাম, কেমন দেখতে হবেন ভদ্রলোক ? যদি খিটখিটে হন, তাহলেই গেছি। সত্যি বলতে কী, বকুনি খাবার অভ্যেস আমার একেবারে নেই। শুনেছিলাম, টেক্সাস জায়গাটা নাকি খুনখারাপির। হলিউড-মার্কা অনেক ফিল্মও টেক্সাসি নায়কের রোমাঞ্চকর ঘটনা নিয়ে তৈরি হয়েছে।

তা হোক, ল্যানিকে দেখার পর কিন্তু আমার মনের সব ভয়ভাবনা কেটে গিয়েছিল। একটু মোটাসোটা, হাসিখুশি মানুষ। বিদেশী ছাত্র নিয়েই ওঁর বেশি কারবার। সেজন্য কথা বলেন সহজ ইংরেজিতে। তবে টেক্সানদের ইংরেজি বোঝা শক্ত। ল্যানি একটা বিরাট র‍্যাঞ্চের মালিক। উত্তর আমেরিকায় গোরু-মোষ-ঘোড়া পালনের বিস্তীর্ণ জমিকে বলে র‍্যাঞ্চ। ল্যানির গোরু-মোষ নেই। আছে ঘোড়া। তিনটি ভিন্ প্রজাতির গোটা তিরিশেক ঘোড়া। বাগবাজারের ঘিঞ্জি এলাকা থেকে ওখানে গিয়ে প্রথম প্রথম তো যা দেখতাম তাতেই অবাক হয়ে যেতাম। কোনো লোকালয় নেই, বাস-ট্রাম, দোকানপাট নেই। একটা র‍্যাঞ্চ থেকে অন্যটিতে যেতে হলে সম্বল শুধু ঘোড়া। ওই বাহনটির পিঠে চেপেই যাতায়াত। এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ির দূরত্ব কমপক্ষে তিন-চার মাইল।

অন্য সব র‍্যাঞ্চের মালিক বা লোকেরা কিন্তু ল্যানি বলতে অজ্ঞান। হবেই বা না কেন, ল্যানি বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন শুটার, সারা আমেরিকার গর্ব। শ্রদ্ধাও করেন ওঁরা খুব। স্থানীয় লোকেরা খুবই মিশুকে। অল্পদিনের মধ্যে আমিও ওঁদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলাম। ছেলেবেলায় কলকাতার রেসকোর্সের ধারে সকালে মাঝে-মধ্যে গিয়ে ঘোড়া চড়া শিখে নিয়েছিলাম। সেজন্য আশপাশের র‍্যাঞ্চে গিয়ে আড্ডা মারতে আমার অসুবিধা হত না। অন্য কোনো কাজই ছিল না ওখানে। সকাল-বিকাল রাইফেল ঘাড়ে রেঞ্জে যাওয়া, আর প্র্যাকটিস। বাকি সময়—যেমন খুশি তেমন কাটাতাম। কিছুটা একঘেয়ে বটে, তবে কোনো কিছু সাধনা করার পক্ষে আদর্শ জায়গা।

ল্যানি কোনো সময়েই দু'তিনজনের বেশি ছাত্র নেন না। ঠিক ওলিম্পিকের আগে আমার সঙ্গে ছিলেন একজন কোরীয়। এছাড়া দফায়-দফায় আসতেন বিজনেস ম্যানেজমেণ্টের শিক্ষার্থীরা। মাঝে-মাঝে ছুটিতে রাত্তিরে চমৎকার আড্ডা হত। উন্মুক্ত প্রান্তরে আকাশের নীচে আগুন জ্বালিয়ে আমরা সবাই গোল হয়ে বসতাম। আগুনের তাপে মাংস ঝালিয়ে নেওয়া হত। খাওয়া, গল্প, গানবাজনা সবই চলত। ওদের রান্না মশলাহীন, খাবার সব শুকনো। ঝলসানো মাংসের ওই খাবারকে ওরা বলে বার্বিকিউ। প্রথম দিকে কিছুটা অসুবিধা হলেও পরে মানিয়ে নিয়েছিলাম। মনে আছে, একদিন ওই আসরে আমি রামায়ণের গল্প শুনিয়ে তারিফ পেয়েছিলাম।

টেক্সাসে থাকার জন্য আর ল্যানির ট্রেনিংয়ের গুণে আমার চোখ ফুটে গিয়েছিল। ল্যানি বলতেন, "এই পৃথিবীতে একজন মানুষের সঙ্গে অন্যজনের পার্থক্য কোথায় জানো—শুধু মনের শক্তিতে। যে-মানুষ প্রতিকূল পরিবেশের তোয়াক্কা করে না—সে-ই জেতে। আর যে সিঁটিয়ে যায়, তার দ্বারা কোনো কিছুই হয়ে ওঠে না।" ল্যানি আরও বলতেন, "রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই খাতায় লিখবে—'আমি সোমা দত্ত, আমি শুটিংয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। সারা বিশ্বে আমার সমকক্ষ আর কেউ নেই।'" লস অ্যাঞ্জেলেসের শুটিং রেঞ্জে একদিন উনি একজন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নকেও দেখালেন। ভুল বললাম, শুধু দেখালেন বলাটা ঠিক হবে না, দেখিয়ে আলাপও করিয়ে দিলেন। নাম ম্যালকম কুপার। বললেন, "এই ছেলেটিই আবার ওলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন হবে। ওঁকে ভালভাবে লক্ষ করো। যখন তুমি প্র্যাকটিস করবে না, তখন কুপারের প্র্যাকটিস মন দিয়ে দেখবে। ওঁর দাঁড়ানোর কায়দা, রাইফেল ধরার ভঙ্গি, বাতাস এড়িয়ে গুলি করার কৌশল, ওর একাগ্রতা—সব কিছু শিখে নেবে।" আমি এই গুরুবাক্য পরে অক্ষরে অক্ষরে মেনেছি। ল্যানির কথাই ঠিক হয়েছিল। কুপার ওলিম্পিক-সোনাই শুধু জেতেননি, বিশ্বরেকর্ডও স্পর্শ

প্রাথমিক চিকিৎসা সংবাদ!

স্পটস্ ও প্যাচেস

কেবলমাত্র ব্যাণ্ড-এড্
এই সুবিধেজনক আকারে পাওয়া যায়

একটি রাউণ্ড
ড্রেসিং যেখানে অন্য
কোনটিই ভাল দেখাবে না

একটি স্কোয়ার
ড্রেসিং যেখানে অন্য
কোনটিই সেঁটে বসবে না

ব্যাণ্ড-এড্

উত্তমভাবে সুরক্ষা প্রদান করে ও দ্রুত উপশম করে

Johnson & Johnson

OBM/3810/BEN

করেছিলেন লস অ্যাঞ্জেলেসে। প্রি-ওলিম্পিকের সময় চিনো-র রেঞ্জে বিদেশী বহু শুটারকে কাছ থেকে দেখেছি। ওঁরা অদ্ভুত পোশাক পরতেন। পোশাক বলতে বোঝাচ্ছি শুটিংয়ের পোশাক। ওঁরা ব্যবহার করতেন ক্যানভাসের জ্যাকেট। ভারতে কোনো শুটারকেই এটা কোনোদিন পরতে দেখিনি। মহাকাশচারীদের ছবি তোমরা অনেকেই দেখেছ। ঠিক ওরকম ফোলানো ফাঁপানো নয়, তবে ক্যানভাসের জ্যাকেট পরা শুটারদের দেখে কেন জানি না, আমার মহাকাশচারীদের কথা মনে হচ্ছিল।

ল্যানির কাছে একদিন আব্দার করলাম, আমারও ওই ক্যানভাস জ্যাকেট চাই। চাইলেই তো আর পাওয়া যায় না! ওই ধরনের জ্যাকেট তৈরি হয় ফিনল্যাণ্ডে। প্রচুর দাম। তা ছাড়া মাপসই পেতে হলে মাসখানেক অপেক্ষা করতেই হবে।

ল্যানি বললেন, "এখুনি অর্ডার দিতে হবে। না হলে ওলিম্পিকের আগে ওটা তুমি হাতে পাবে না।" ওঁর অসাধ্য কিছু নেই। সত্যি-সত্যি, ওলিম্পিকের আগে ক্যানভাস জ্যাকেট হাতে পেয়ে গেলাম। পরে দেখি কী আরাম! প্র্যাকটিসের সময় খুব স্বচ্ছন্দে অনুশীলন করতে পারছিলাম। বড় শুটার হতে গেলে এই সব আনুষঙ্গিক সরঞ্জামগুলি অবশ্যই দরকার।

যেমন ধরো, শুটিংয়ের প্রধান জিনিস রাইফেল। আমাদের দেশে আধুনিকতম রাইফেল, বলতে গেলে, অধিকাংশ শুটারের হাতে নেই। অন্য দেশে যা বাতিল হয়ে গেছে, সেই মডেলের রাইফেল নিয়েই সাধারণত আমরা প্রতিযোগিতায় নামি। ভগীরথদা (সামই) কয়েকবছর আগেও বাইশ সালের মডেলের রাইফেল নিয়ে কম্পিটিশনে নামত। হালে বাহাত্তর সালের মডেল যোগাড় করেছে। আর তাতেই অসম্ভব উন্নতি করেছে। সার্ভিসেসের লোকেরই এই অবস্থা! অন্যদের অবস্থা যে কী, এর থেকেই তা বুঝে নাও। এই রাইফেল একবার বিগড়ে গেলে আরও মুশকিল সারাবার উপায় নেই। লস অ্যাঞ্জেলেসে বিশ্বখ্যাত সব রাইফেল প্রস্তুতকারক কোম্পানিগুলি দোকান খুলেছিল। ওরা বিনা পয়সায় শুটারদের রাইফেল সারিয়ে দিচ্ছিল। ভগীরথদাকে দেখলাম, পুরো রাইফেলটাই প্রায় বদলে নিল পার্টস জোড়া লাগিয়ে।

আমি যে রাইফেল নিয়ে নামি, সেটা হল জার্মান কোম্পানির। ওয়ালথার। তাও আবার সেটা আমার নিজের নয়। প্রাপ্তবয়স্ক না হলে আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স পাওয়া যায় না। আমার বয়স ষোলো। লাইসেন্স পাইনি। বাবার রাইফেলটা সেজন্য ব্যবহার করতে হয়। এশীয় গেমসে ওই রাইফেল নিয়েই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলাম। হালকা রাইফেলটা ভেঙে গেছিল। সারাবার জায়গা নেই আমাদের দেশে। ফলে ভাঙা রাইফেলটাই বয়ে নিয়ে গেছিলাম লস অ্যাঞ্জেলেসে। ওখানে ফাঁকতালে আনসুজ কোম্পানির লোকদের দিয়ে সারিয়ে নিলাম। এ তো গেল এয়ার রাইফেলের কথা। স্মলবোর অন্য রাইফেলটা রেখে দিয়েছি ল্যানির কাছে। টেক্সাসে। ওখানে গেলে সেটা নিয়েই প্র্যাকটিস করি।

বুঝতে পারছি, এত সব রাইফেল-টাইফেলের কথা তোমাদের নিশ্চয়ই পছন্দ হচ্ছে না। রাইফেল, পিস্তল, রিভলভার—এসবের কথা শুনলেই ভয়-ভয় লাগে। এসব তো পুলিশ আর মিলিটারির জিনিস। মানুষ কেন, বড়-বড় বাঘ, হাতিও মেরে ফেলা যায় এসব দিয়ে। কথায় বলে রাগ চণ্ডাল। ধরো, একজন শুটারের প্রচণ্ড রাগ হল কারও ওপর। সে তো দুম্ করে তাকে মেরে ফেলতেও পারে! বাস্তবে অবশ্য এই ধরনের ঘটনা কখনো ঘটেনি। তবু সাবধানের মার নেই। একজন শুটার কখনোই বাড়িতে রাইফেল হেলাফেলায় হাতের কাছে রাখবে না। রাইফেলের বিভিন্ন অংশগুলি স্বভাবতই সে আলাদা-আলাদা রাখবে। আর কার্তুজ রাখবে বাক্সবন্দী করে। আমার বাড়িতেও বাবা-মা রাইফেলগুলি রাখেন এভাবে। দোতলার ঘরে যদি বাঁট থাকে, তেতলায় ব্যারেল। হয়তো দেখা যাবে, কার্তুজের বাক্স তখন দেড়তলায় এবং তারও চাবি আবার মায়ের আঁচলে। অর্থাৎ কিনা, আমাদের বাড়িতে যদি কখনও ডাকাত পড়ে, তাহলে রাইফেল সাজাবার ফাঁকেই ব্যাটারা পালাবার যথেষ্ট সময় পেয়ে যাবে।

কার্তুজের আবার সমস্যা আছে। একে দাম বেশি, তার ওপর সহজে পাওয়া যায় না। বিদেশ থেকে আনাতে হয়। ভারতীয় শুটারদের কাছে এক-একটি গুলি মণিমুক্তোর থেকেও দামি। নর্থ ক্যালকাটা রাইফেল ক্লাব ও শ্রীরামপুরের রাইফেল ক্লাবে দেখেছি কী কৃপণতার সঙ্গেই না শুটাররা গুলি খরচ করেন। সত্যি বলতে কী, আমি এ-ব্যাপারটিতেও বেশ ভাগ্যবান। বাবা সরকারের কাছে অনুমতি চেয়েছিলেন, যাতে বিদেশ থেকে সরাসরি নিজে গুলি আনতে পারেন। ওঁরা অনুমতি দিয়েছেন। ফলে গুলির ব্যাপারে আমাকে কখনও কোনো সমস্যায় পড়তে হয়নি।

টেক্সাসে ল্যানির র‍্যাঞ্চে থাকার সময় তাই ভাবতাম, ভগবান আমাকে অনেক সুবিধা দিয়ে পাঠিয়েছেন। যে সুবিধাগুলি আমাদের দেশের স্পোর্টসম্যানেরা খুব কম পায়। এটা আমার কাজে লাগানো উচিত। গতবছর কলকাতায় যখন টেস্ট ক্রিকেট হচ্ছিল, তখন সুনীল গাওস্কর আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। ঘণ্টাখানেক ছিলেন। উনি সেদিন আমাকে ঠিক ওই একই কথা বলেছিলেন। ল্যানির বলা একটা কথা বারবার সেই সময় মনে পড়ত গাওস্করের সঙ্গে আলাপ হবার পর। আমাদের দেশে জন্মে যদি গাওস্কর বিশ্বের অন্যতম সেরা ক্রিকেটার হতে পারেন, তাহলে আমিই বা বিশ্বের অন্যতম সেরা শুটার হতে পারব না কেন?

ওলিম্পিক আসরের গল্প বলতে বলতে এইসব ব্যক্তিগত ভাবনার কথা লিখছি, কারণ ওখানকার ফলাফলের কথা ভুলে যেতে চাই। যখনই মনে হচ্ছে, ওলিম্পিকে আমি উল্লেখযোগ্য কিছুই করতে পারিনি, তখনই হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছে। মা-বাবার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না, ল্যানিও আমার জন্য যথেষ্ট করেছেন। তবুও পারলাম না কেন? ৩১ জুলাই ছিল আমার প্রথম কম্পিটিশন। এয়ার রাইফেলে। রেঞ্জে যাবার আগে ল্যানি আমাকে পইপই করে বলে দিলেন, "সোমা, ঘাবড়ে যেও না। মনে করবে প্র্যাকটিসে গুলি ছুঁড়ছ। মেয়েদের এটা প্রথম ওলিম্পিক। তোমার মতো সবাই নার্ভাস থাকবে—চিনা, কোরীয়, মার্কিন, সবাই। যেমন তোমার, তেমনি এদেরও কারও ওলিম্পিক অভিজ্ঞতা নেই। যাও, মাথা ঠাণ্ডা রেখে কম্পিটিশন করো। উইশ ইউ গুড লাক।"

আমার হাতে অল্প চাপ দিয়ে উনি ছেড়ে দিলেন। রেঞ্জে ঢোকার মুখে হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, হাতটা ঘামছে। (ক্রমশ)

টারজান

এডগার রাইস বারোজ

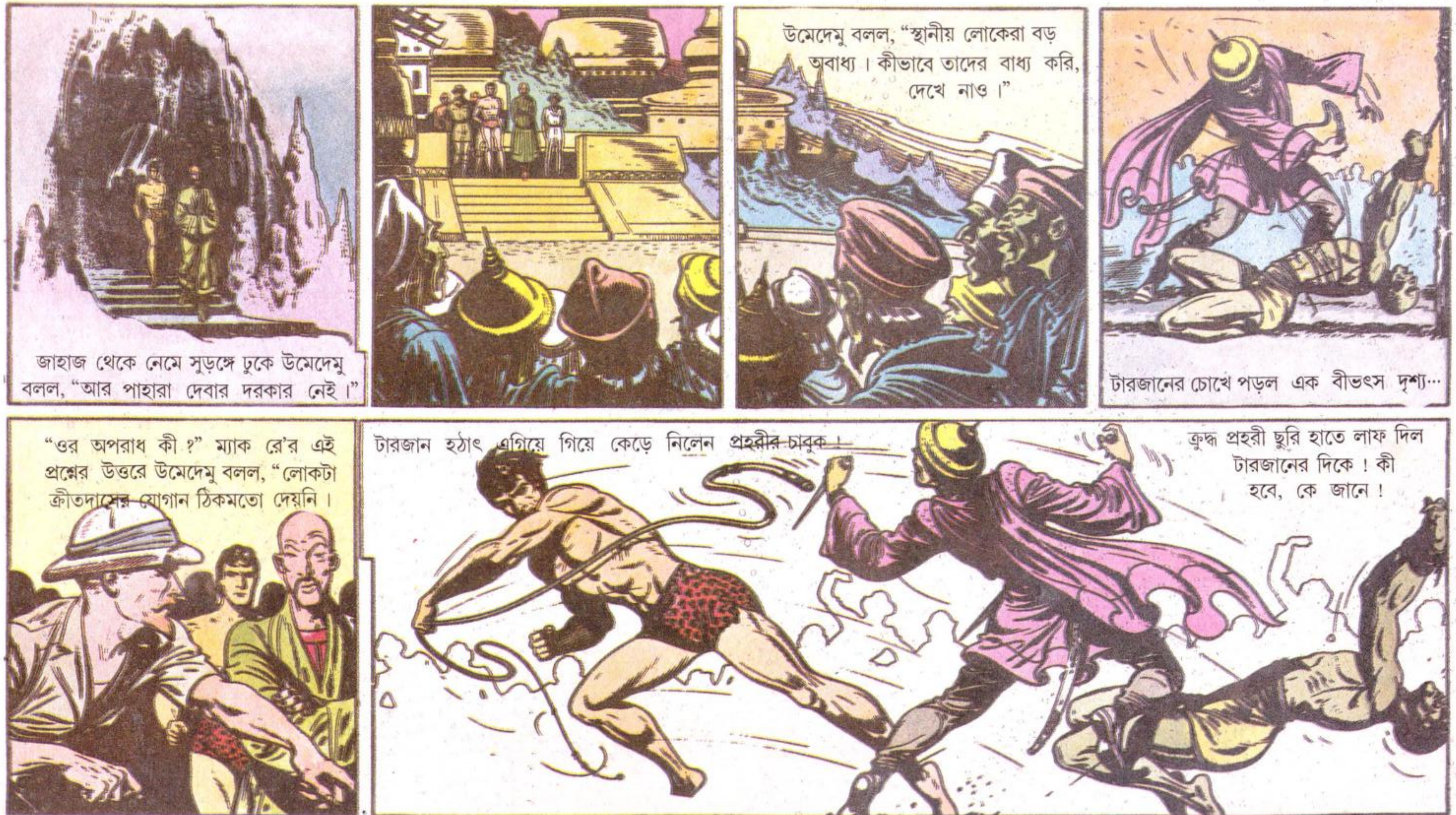

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

নবকেষ্টর ভেল্‌কি

হীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

"থাম তো, মেলা ফ্যাচ-ফ্যাচ করিসনি।" আস্ত একটা পানতুয়া গেলার মতো মুখ করে টেবিল চাপড়ে ভোম্বলদা ফোঁস করে উঠল, "আমি মরছি নিজের জ্বালায়—আর উনি এসেছেন রসিকতা করতে। বাঁদর কোথাকার!"

ধমক খেয়ে দুবার চোখ পিট-পিট করে মেঝের ওপর ধপাস করে বসে পড়ল গাবলু। ভোম্বলদা ফের ভুরু কুঁচকে হাত মুঠো করে চক্কর দিতে লাগল সারা ঘর।

আমাদের মুখে টুঁ শব্দ নেই। কী করেই বা থাকবে! ভোম্বলদার যা মনের অবস্থা এখন—বেফাঁস কিছু বলে ফেললে আর রক্ষে আছে! গাবলুটাও এমনি মাথামোটা—এই সময়ে কেউ ওয়াক-ওভার দেবার কথা বলতে যায়? ফাইনালে উঠে ওয়াক-ওভার!

বলতে গেলে একেবারে জীবন-মরণ সমস্যা এবার। এরকম সমস্যায় জীবনে পড়িনি আমরা। ভোম্বলদা—যে ভোম্বলদা একবার হাঁক ছাড়লে জাত অ্যালসেশিয়ানের পিলে চমকে যায়, তার পর্যন্ত কী অবস্থা! মুখখানাকে আমসি করে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর খ্যাপার মতো মাঝে-মাঝে খামচে ধরছে মাথার চুল।

উপায় নেই, আমাদের ট্যাংরাহাটা স্পোর্টিং ক্লাবের মানসম্মান বাঁচাবার আর কোনো রাস্তা নেই। পর-পর তিনবারের ফুটবল চ্যাম্পিয়ন ট্যাংরাহাটার সমস্ত প্রেস্টিজ এবার ধুলোয় গুঁড়িয়ে যাবে। তাকে কলা দেখিয়ে এবার ট্রফি নিয়ে যাবে তালএঁটে মোহনপুর। বেশি দেরিও নেই আর, মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরেই ঘটে যাবে সেই মারাত্মক ব্যাপার!

অস্থিরভাবে চরকির মতো ঘুরতে-ঘুরতে একবার থমকে দাঁড়াল ভোম্বলদা। ট্যাংরাহাটা স্পোর্টিং ক্লাবের ডাকসাইটে সেক্রেটারি ভোম্বলদা কুইনাইন গেলার মতো মুখ করে তাকাল ক্লাবের শেষ আশা-ভরসা প্যালার দিকে। গলা থেকে চিঁ-চিঁ করে আওয়াজ বেরুল, "কী রে প্যালা, কী করি বল!"

আর প্যালা! প্যালার মুখ তখন ফ্যাকাসে। কে বলবে এ সেই প্যালাদা, যার পায়ে বল পড়লেই বিপক্ষের ডিফেন্স একেবারে উচ্চিংড়ের মতো লাফাতে শুরু করে! ভাল করে কিছু বুঝবার আগেই যে বল নিয়ে পৌঁছে যায় গোলের সামনে। বলতে গেলে এ পর্যন্ত মোট সতেরোটা গোল করে ওই তো ট্যাংরাহাটাকে ফাইনালে টেনে নিয়ে গেছে।

কিন্তু এ তো আর সে-খেলা নয়! মোহনপুর যে ফাইনালে উঠে দুম করে এ-রকম একটা কাণ্ড করে বসবে কে জানত! কথাটা হয়তো জানাই যেত না, গাবলুই এসে খবরটা দিয়েছিল প্রথম। সকালেই প্র্যাকটিস সেরে সবে তখন ভোম্বলদা প্যালাকে একটু জ্ঞান দিতে যাচ্ছে, গাবলু এসে দাঁড়াল ঝড়ের মতো। ফোঁস-ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে বলেছিল, "দারুণ ব্যাপার, মোহনপুর প্লেয়ার হায়ার করেছে।"

"করুক না, তাতে হয়েছে কী?" ভোম্বলদা পাত্তাই দেয়নি গাবলুকে।

"না না, যে-সে প্লেয়ার নয়—ফার্স্ট ডিভিশনের প্লেয়ার। এই মাত্তর পৌঁছল এসে কলকাতা থেকে।"

"ফার্স্ট ডিভিশনের প্লেয়ার!"

"তবে আর বলছি কী ! নামও জেনে এসেছি আমি—নাদু মল্লিক আর খোকা সামন্ত ।"

এবার অবাক হবার পালা প্যালার । গোল-গোল চোখ করে একটা ছোট্ট ক্লাবের নাম করে বলেছিল, "আমি তো চিনি ওদের—দারুণ খেলে !"

"তুই চিনিস ?" ভোম্বলদার ভুরু কুঁচকে গিয়েছিল ।

"নেদোদাকে চিনি, মারাত্মক স্টপার । খোকা সামন্ত স্ট্রাইকার ।"

ভোম্বলদার মুখে কথা আটকে গিয়েছিল । শেষ পর্যন্ত মোহনপুর—

সেই যে পায়চারি শুরু হয়েছে, এখনও থামেনি । কখনো মুঠো পাকাচ্ছে, কখনও দাঁত কিড়মিড় করছে, আর মাঝে-মাঝে প্যালার দিকে তাকাচ্ছে করুণদৃষ্টিতে । সেইভাবেই আর-একবার এগুতে যাচ্ছিল প্যালার দিকে । আর ঠিক সেই মুহূর্তে ক্লাবঘরে ঢুকে পড়েছে নবকেষ্ট ।

না, এতটুকু উত্তেজনা নেই, দুশ্চিন্তা নেই—চারদিকে তাকিয়ে একবার ছোট্ট করে মুচকি হেসেছে । যেন কিছুই হয়নি এইভাবে বেঞ্চিতে বসতে বসতে বলেছে, "ব্যবস্থা করে এলুম ।"

"ব্যবস্থা ! কিসের ব্যবস্থা ?" ভোম্বলদার ভুরু এখন নাইনটি ডিগ্রি অ্যাংগেলে ।

"জেতার ব্যবস্থা ।"

"তার মানে ?"

"মানে আবার কী ?"

একখানা বিরাট হাই তুলে তুড়ি বাজাতে বাজাতে নবকেষ্ট বলেছে, "আমাদের জেতার ।"

রাগে-দুঃখে ভোম্বলদার মুখ-চোখ লাল হয়ে গেছে । আমরা মনে মনে প্রমাদ গুনছি—যে-কোনো মুহূর্তে ফেটে পড়তে পারে ভোম্বলদা । অথচ নবকেষ্ট নির্বিকার । কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সে পকেটে হাত ভরে চুইংগামের প্যাকেট বার করেছে ।

ছেলেটা বরাবর ওই রকমের । ওপর থেকে মনে হবে ভাজা মাছটি উলটে খেতে পারে না, অথচ ফিচলেমি বুদ্ধি মগজে একেবারে গিজ-গিজ করছে । ইস্কুলের মাস্টারমশাইদের পর্যন্ত নাজেহাল করে ছাড়ে মাঝে-মাঝে ।

কিন্তু এ তো একটা আলাদা ব্যাপার । এই রকম অবস্থাতেও যদি ও এই সব মারাত্মক রসিকতা শুরু করে—

খবরটা শুনে অবশ্য ও নিজে থেকেই বেরিয়ে গিয়েছিল ; বলেছিল, "দেখি খোঁজখবর নিয়ে একবার—"

কিন্তু সত্যিই যে এখন আর কিছু করবার নেই সে আর আমাদের চেয়ে ভাল জানে কে ! কাজেই ওইভাবে কথা বললে—

ততক্ষণে ভোম্বলদা এগিয়ে এসেছে ওর সামনে । চোখ দিয়ে আগুন ছুটছে । বলেছে, "জিতব অমনি বললেই হল ! প্লেয়ারদুটো খেলবে না ?"

"খেলবে না মানে ?" নবকেষ্ট তখন এক টুকরো চুইংগাম মুখে পুরেছে । "খেলবে বলেই তো এসেছে ।"

"সে তো আমিও জানি," ফেটে পড়তে আর বিশেষ বাকি নেই ভোম্বলদার, হাতের আস্তিন গুটিয়ে বলেছে, "খুলে বলবি সব, নাকি—"

হয়েই বোধহয় যেত একটা কিছু, কিন্তু তার আগেই উঠে পড়েছে নবকেষ্ট । বিরক্ত মুখে বলেছে, "যা বলার খেলার পরেই বলব । প্যালাদা গোল পেলেই তো হল—"

রেগেমেগে কী একটা বলতে যাচ্ছিল ভোম্বলদা, কিন্তু নবকেষ্ট ততক্ষণে বেরিয়ে গেছে ঘর থেকে । রাগে গরগর করতে-করতে টেবিলের ওপর দুম্ করে একটা কিল মেরে ভোম্বলদা বললে, "ঠিক আছে, খেলাটা শেষ হতে দে আগে—"

আঃ, খেলে বটে খোকা সামন্ত ! পায়ে যেন আঠা লাগানো । প্রথম দশ মিনিট সারা মাঠে ও একাই খেলে গেল । আমাদের ডিফেন্সকে একেবারে তছনছ করে পর-পর দুখানা মাঠ-কাঁপানো শট । দুটোই গোল ! দ্বিতীয় গোলের সময় ভুলে আমি নিজেও হাততালি দিয়ে উঠলাম—খেয়াল হল ব্রহ্মতালুতে টকাস করে একটা গাঁট্টা খেয়ে । অবশ্য ভোম্বলদার তখন আর আমার দিকে বেশি মন দেবার অবস্থা নেই । খ্যাপা ষাঁড়ের মতো সে তখন খুঁজে বেড়াচ্ছে নবকেষ্টকে ।

বলতে গেলে বল আমাদের পায়ে পড়ল দু-দুটো গোল খাওয়ার পর । লেটো বল ঠেলে দিল ছাতুকে, ছাতু একেবারে থ্রু করল প্যালাকে । প্যালা ছুটছে—মোহনপুরের দু-জনকে কাটিয়ে নিল । সামনে এবার নাদু মল্লিক । চেঁচাবার শক্তিও নেই আমাদের—বিরাট চেহারার নাদু মল্লিক ছুটে আসছে প্যালার দিকে ।

কিন্তু এ কী ! ঠিক দেখছি তো ? এও কি সম্ভব ! কলকাতা মাঠের নামকরা স্টপার নাদু মল্লিক হঠাৎ যেন সরে গেল পাশে । আর সেই সুযোগে বল নিয়ে প্যালা গোঁত্তা খেয়ে পড়ল গোলের সামনে । পরক্ষণেই একটা আকাশ-ফাটানো চিৎকার ।

ট্যাংরাহাটা স্পোর্টিং ক্লাব গোল শোধ করেছে একটা । প্যালাই দিয়েছে । কিন্তু সেটা তো কেবল আরম্ভ ! আরো

স্পার্কো-র
এ্যাডভেঞ্চার-১
গ্রীষ্মের ছুটি। সন্দীপ আর রোহিত জঙ্গলে বেড়াচ্ছে।
"রোহিত, দ্যাখ তো! ওখানে আগুন লাগল নাকি?"
"রোহিত, শিগগির! বেশ খানিকটা জল ঢালতে হবে।"
"আগুন ছড়াতে দেওয়া চলবে না।"
"ফস...ফস...ফস... তিন দফা ঢালা হয়ে গেল। এবার হয়ত নিভেছে, কি বল?"
"রোহিত, আমরা বরং কিছুক্ষণ থেকে দেখি — আগুন না আবার জ্বলে ওঠে!"
"শোনো ভাই, তোমাদের বেশ চটপটে উপস্থিত বুদ্ধি আছে তো।"
"নিশ্চই কোনো অসাবধানী ধূমপানকারী জ্বলন্ত সিগারেট ওখানে ছুঁড়েছে।"

বিজ্ঞাপন

"তোমাদের সতর্কতা জংগলের ক্ষয়ক্ষতি বাঁচালো।"
"খোকা, তুমি কোন ক্লাশে পড়ো? বড় হয়ে কি করবে?"
"আমার নাম রোহিত। সপ্তম শ্রেনীতে পড়ি। ইঞ্জিনিয়ার হতে চাই।"
"আমি সন্দীপ। অষ্টম শ্রেনীতে পড়ি। ডাক্তার হব।"
"তোমার চিকিৎসা-বিদ্যের দিকে ঝোঁক কেন?"
"আমার এক বন্ধু সাংঘাতিকভাবে পুড়ে গিয়েছিল!"
"তাদের রান্নাঘরে একটা কেরোসিন স্টোভ ফাটার দরুণ ঐ বিপদ!"
"মেয়েটি অনেক সপ্তাহ হাসপাতালে ছিল।"
সে এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়নি

"সন্দীপ, তুমি কি মানুষকে আগুনে পোড়া বা জখমের হাত থেকে সত্যিই বাঁচাতে চাও?"
??
"তাহলে, আমি তোমাকে এমন একটা যাদু-শক্তি দিতে পারি – যা আগুন থেকে বাঁচানোর কাজে তোমাকে সাহায্য করবে। তবে সেটার অপব্যবহার করা চলবে না।"
"আচ্ছা ঠিক আছে, স্বামীজী।"
SPARKO
SPARKO
SPARKO
SPARKO
SPARKO
"এই নাও, এই আংটিটা ডান হাতের মাঝের আঙুলে পরে নাও।"
"আংটিটা ঘোরাতে ঘোরাতে বলবে – স্পার্কো এসো...।"
COME SPARKO
SPARKO
SPARKO
SPARKO

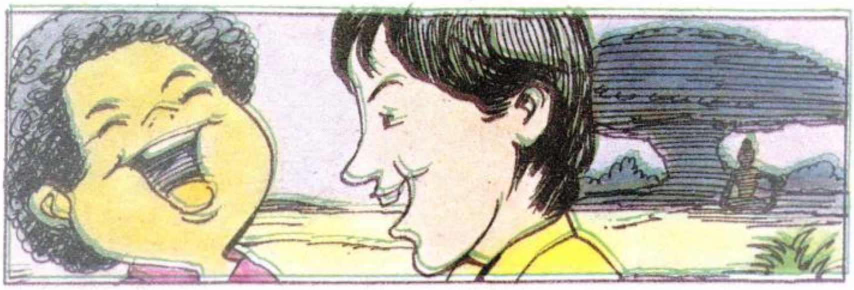

Watch out for surprise gift coupons next time.
Issued by Loss Prevention Association of India Ltd.
to promote fire prevention and safety.

LPA
सुरक्षैव समृध्दये

maa (n) 568/83 BEN

(আরও "স্পার্কোর অ্যাডভেঞ্চার" আগামী সংখ্যায়)

দুবার পায়ে বল পেল প্যালা, আর ঠিক আগেকার মতোই শেষ মুহূর্তে যেন মন্ত্রবলে ছিটকে গেল নাদু মল্লিক, এবং—

হ্যাঁ, আরও দুটো গোল করে হাফ-টাইমে প্যালা আমাদের এগিয়ে দিল এক গোলে।

ভোম্বলদার চেহারা তখন অন্যরকম। প্রবল উৎসাহে তখন ও নেমে পড়েছে মাঠে। হাত-পা নেড়ে নেচে-কুঁদে উৎসাহ দিচ্ছে টিমকে—যেন ট্রফিটা জিতেই গেছি আমরা।

জিতলাম অবশ্য আমরাই। খোকা সামন্ত আরও দুখানা গোল করলে কী হবে, প্যালা ডবল হ্যাটট্রিক নিয়ে গোল করলে মোট সাতখানা। অবিশ্বাস্য ব্যাপার! সাত-চার গোলে ট্যাংরাহাটা পর-পর চারবার চ্যাম্পিয়ন।

বিচারকের মতে প্যালা বেস্ট প্লেয়ার, কিন্তু আমাদের কাছে বেস্ট প্লেয়ার হয়ে গেল নবকেষ্ট। প্যালার কাছেও তাই—গোটা ব্যাপারটাই তার কাছে একটা ভেলকি।

ট্রফি পাওয়ার পর পুরো দু-ঘণ্টা আমরা ঘুরে বেড়ালাম পাড়া কাঁপিয়ে। নবকেষ্ট বলতে গেলে আমাদের কাঁধে কাঁধেই ঘুরল। শেষকালে ভোম্বলদার বাড়ি পৌঁছতে সে শরীরটাকে তিন ভাঁজ মুচড়ে ওয়াটারলু যুদ্ধজয়ের ভঙ্গিতে বলল, "আজ এখানেই তোদের গ্র্যাণ্ড ফিস্ট—লুচি মাংস অ্যাণ্ড মিষ্টি।"

ফাইন! এই না হলে ভোম্বলদা। আমরা যখন আর এক প্রস্থ "হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে" করে পরিষ্কার-টরিষ্কার হবার জন্যে এগুচ্ছি, প্যালা তখনও বসে আছে নবকেষ্টর পাশে।

"বলবি না মানে, বলতেই হবে তোকে," প্যালা ওর কাঁধ চেপে ধরেছে।

"আঃ, কী যে করো না প্যালাদা," নবকেষ্ট উসখুস করছে, "জিতেই যখন গেছি—"

"ধ্যাত! জিতে গেছি," দাঁত খিচিয়ে উঠল প্যালা, "আমার মতো এরকম তিনটে প্লেয়ারকে নেদোদা এক পায়ে রুখতে পারে! বল তুই কী বলেছিস?"

"বলব আবার কী, বললাম," নবকেষ্ট আমতা-আমতা করতে লাগল, "মানে যাতে তোমাকে না ছোঁয়, সেই জন্যে।"

"ছোঁবে না? কেন?"

"মারাত্মক অসুখ থাকলে কেউ ছোঁয় নাকি?"

"মারাত্মক অসুখ?"

"হ্যাঁ, মানে ছোঁয়াচে আর-কি। আলাপ করে বললুম, পাড়ার ছেলেরা তো জানে—সেই জন্যেই কেউ বাধা দেয় না তোমায়। তাই জন্যেই তুমি টপ-স্কোরার। ওকে বললাম একটু সাবধানে থাকতে, এই আর কী।"

রাগে কথা বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল প্যালার, "নেদোদা আমায় কথা দিয়েছে সামনের বার কলকাতার মাঠে খেলাবে, আর তুই কি না—"

শেষ হবার আগেই তড়াক করে উঠে পড়েছে নবকেষ্ট। তার লিকলিকে শরীরটা ধনুক থেকে ছুঁড়ে দেওয়া তীরের মতো শাঁ করে ছুটে গিয়েছে সামনে।

আমরা হতভম্ব! প্যালার অবস্থা আরও খারাপ!

একটু পরেই রান্নাঘর থেকে খাসা একটা খুশবু ভেসে এল। বেচারি নবকেষ্ট!

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

নকল ভীম

দেবব্রত ঘোষ

ঘুসির ঘায়ে কেউ হল কাত,
কেউ চিতপাত চাপড়ে,
দাপট দেখে সবাই বলে,
'যাসনে কাছে, বাপ্ ওরে।'
নিম্নে গড়ায় রথের চাকা,
শূন্যে চেঁচায় সারথি:
'সেই বেয়াদপ এগিয়ে আসুক,
যার বেড়েছে বাড় অতি!'
ঘুরছে গদা ডাইনে-বাঁয়ে,
হটছে পিছু সকলে,
সন্দেহ নেই, সেই আগেকার
বীর ভীমেরই নকল এ।
ঘুসির ঘায়ে বেহুঁশ হাতি,
রাক্ষস চিত চাপড়ে,
খেলার কুরুক্ষেত্র যেন
যেমন ছিল দ্বাপরে।

ছবি : অনুপ রায়

সারা অঙ্গে কোমলতার পরশ

এখন স্নানের পরে এক
কোমলতার নতুন অনুভূতির
জগতে প্রবেশ করুন।
নতুন পণ্ডস্ কোল্ড ক্রীম
সাবানের সমস্ত গুণই ছড়িয়ে
পড়বে আপনার সারা অঙ্গে...
আপনার ত্বককে করে তুলবে
মোলায়েম ও কোমল।

নতুন

পণ্ডস্

কোল্ড ক্রীম সাবান

পণ্ডস্ কোল্ড ক্রীমের
সমস্ত গুণে ভরা

OBM/3920/BN

মড়ার ওপর খাঁড়া

নবকুমার বসু

সোমদেব আর বুড়ো দুই বন্ধু, ডাক্তারি পড়তে সবে মেডিক্যাল কলেজে ঢুকেছে। বুড়োর ভাল নাম অবশ্য কিশোর। কিন্তু ডাকনামেই ও প্রথম থেকে কলেজে পরিচিত হয়ে গেছে। তার একটা কারণও ছিল। ক্লাসের অন্যান্য ছেলেদের তুলনায় বুড়ো অনেক ব্যাপারেই একটু বেশি উৎসাহী। কলেজের অনেক খবরাখবর ও আগেই জেনে ফেলত। যেমন, সোমদেব একদিন অ্যানাটমির মড়াকাটা হল-এর কথা জিজ্ঞেস করতেই বুড়ো বলেছিল, "চল, যাবি দেখতে ? আমি দু-একদিন ঘুরে এসেছি। দারুণ।"

নেহাত কৌতূহলবশত দুজন গিয়েছিল ডিসেকশন হল দেখতে। ওদের ফার্স্ট ইয়ারের ডিসেকশন শুরু হতে তখনও মাসখানেক দেরি। কলেজ সীমানার পুব-দক্ষিণ কোণে অ্যানাটমি ব্লক। বিরাট পাঁচতলা বিল্ডিং।

সিঁড়ি দিয়ে কয়েক ধাপ উঠেই পচা গন্ধে নাকে রুমাল চেপে ধরেছিল সোমদেব। বুড়োকে বলেছিল, "উরে বাপ, কী গন্ধ রে, তুই যা বুড়ো, আমি পারব না।"

"কী বলছিস, পারব না !" বুড়ো ওকে অভয় দেওয়ার মতো বলেছিল, "ও কিচ্ছু না, দু-একদিন যাতায়াত করলেই দেখবি গন্ধটন্ধ সব উবে গেছে। চল, চল।"

সোম আর কিছু বলেনি। দুর্গন্ধ, ঘেন্না সব মিশিয়ে সিঁটিয়ে গিয়ে এক-পা এক-পা করে উঠেছিল। ডিসেকশন হলের জালি দেওয়া কাচের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। উঁচু ছাদওয়ালা বিরাট হলঘর। থমথমে গম্ভীর পরিবেশ। সেকেণ্ড ইয়ারের ছেলেমেয়েরা দাঁড়িয়ে ডিসেকশন করছে। লম্বা লম্বা লাইটগুলো ছাদ থেকে নেমে এসেছে শ্বেতপাথর লাগানো টেবিলগুলোর ওপর।

সিঁড়ি ভেঙে নামতে নামতে সোমদেব বুড়োকে বলেছিল, "আমার পক্ষে সম্ভব হবে না মনে হচ্ছে। লাইন চেঞ্জ করতে হবে।"

বুড়ো একটু মাথা নেড়ে বেশ জ্ঞান দেওয়ার মতন বলেছিল, "সোম, এগ্‌জ্যাক্টলি এরকম আমারও মনে হয়েছিল ফার্স্ট ডে ডিসেকশন হলে আসার পর। তবে আর দু-একদিন এলেই দেখবি সব ঠিক হয়ে গেছে। এটা খুব কমন এক্সপিরিয়েন্স। তারপর পড়ার চাপ পড়লে তো কথাই নেই।"

কথাটা অবশ্য বুড়ো মিথ্যে বলেনি। ডিসেকশন শুরু হওয়ার পর যাতায়াত করতে করতে সোম বুঝল, গন্ধ আর দৃশ্যের ব্যাপারগুলো যথারীতি গা-সওয়া হয়ে যাচ্ছে। একটা ঘেন্না-ঘেন্না ভাব কয়েকদিন ছিল বটে, কিন্তু একদিকে শেখার তাগিদ আর একদিকে পড়াশুনার চাপে কবে থেকে সেটাও চলে গিয়েছিল।

বুড়ো আর সোমদেব পার্টনার হয়ে প্রথম ডিসেকশন আরম্ভ করল—অ্যাবডোমেন অ্যাণ্ড পেলভিস, অর্থাৎ পেট এবং তলপেট। দুপুর দুটো থেকে পাঁচটা পর্যন্ত ডিসেকশন। স্যার এসে প্রতিদিন আগে খানিকটা পড়িয়ে বুঝিয়ে দেন, তারপর ওরা নিজেরা ডিসেকশন করে খুঁটিনাটি সব দেখে আর সেই সঙ্গে বই মিলিয়ে পড়ে। অ্যাবডোমেনে অবশ্য বিশেষ কিছু নিজেদের ডিসেকশন করার থাকে না। পেটের ভিতর থেকে একটা একটা করে অরগ্যান বা ভিসেরা কেটে নিয়ে আলাদা করে পড়তে হয়। সময়ও তাই বেশি লাগে।

সাত-আট দিনের মধ্যে অ্যাবডোমেনের ডিসেকশনগুলো ওরা শেষ করে নিল। স্যার এসে বললেন, "এবার তোমরা একটা করে ভিসেরা কেটে নেবে পেটের ভিতর থেকে। কাটার আগে দেখে নিতে হবে, কোথায় কীভাবে অরগ্যানটা থাকে। তারপর সাইড রুমে বসে বসে ডিটেল পড়বে বই থেকে। এক-একটা ভিসেরার জন্য দু'দিন করে সময়।" স্যারের পড়ানো আর ইন্সট্রাকশন দেওয়া শেষ হওয়ার পর প্রথমেই বুড়ো আর সোমদেব পেটের ভিতর থেকে যে অরগ্যানটা আলাদা করে কেটে নিল সেটা পাকস্থলি বা স্টম্যাক। একটা বড় কলাইয়ের ট্রে-র মধ্যে ফুটবলের বেশ মোটা ব্লাডারের মতন গোলাপি রংয়ের স্টম্যাক নিয়ে ওরা ডিসেকশন হলের সঙ্গে লাগানো একটা সাইড-রুমে চলে গেল পড়তে।

তিনতলা ডিসেকশন হলের দক্ষিণে ছোট নিরিবিলি ঘর। মাঝখানে টেবিল আর কয়েকটা বসার টুল ছাড়াও দেয়ালে বোর্ড ঝুলছে। মাঝে মাঝে স্যারেরা ছোট-ছোট গ্রুপ করে ছাত্রদের এই সব ঘরে ক্লাস নেন। বুড়ো পাখাটা খুলে দিল। জানালা খুলে দিল। ছোট ঘরটা আলো-বাতাসে ঝলমল করে উঠল। দুই বন্ধু ট্রে টেবিলের ওপর রেখে নিজেদের লম্বা সাদা অ্যাপ্রন খুলে ফেলল গা থেকে।

ওরা পড়ার জন্য তৈরি হয়ে নিল। বুড়ো কানিংহাম-এর প্র্যাকটিক্যাল অ্যানাটমি বইটা হাতে নিয়ে বলল, "সোম,প্রথমে তুই স্টম্যাকটা ঠিক বডিতে যেমন পজিশনে থাকে, সেইভাবে ধর। আমি পড়ছি। তুই মিলিয়ে দ্যাখ। আর ফরসেপ্স দিয়ে আমাকে দেখা।"

সময়টা শরতের মাঝামাঝি। পুজো আসতে দেরি নেই। ঝলমলে রোদ বাইরে, চকচকে নীল আকাশ। হঠাৎ-হঠাৎ কোত্থেকে উড়ো মেঘ এসে এক-পশলা বৃষ্টি ঝরিয়ে আবার চলে যাচ্ছে। জোর কদমে ডিসেকশন চলে এই সময়টা। কেননা পুজোর ছুটির আগেই যার যে অংশ ডিসেকশন চলছে, সব শেষ করে ফেলতে হবে। ছুটিতে হল পরিষ্কার করে ফেলা হবে। একবার চান্স চলে গেলে খুঁটিয়ে ডিসেকশন করার আর সুযোগ পাওয়া যাবে না। ওপর ওপর পুরো স্টম্যাকটা পড়া হয়ে গেলে সোমদেব বলল, "বুড়ো, এবার তুই স্টম্যাকটা ধর। আমি পড়ছি।"

বুড়ো বলল, "ঠিক আছে, দে। তুই তাহলে হাত ধুয়ে আয়, আমি স্টম্যাকটা ওপেন করছি। কটা বাজে রে?"

সোম টুল থেকে দাঁড়িয়ে উঠে ঘড়ি দেখে বলল, "তিনটে কুড়ি। কেন?"

"ভাবছি আজকেই স্টম্যাকের ডেসক্রিপশনটা পড়া শেষ করে ফেলব।" বুড়ো বলল। "আমাকে আজ রাত্তিরে কেমিস্ট্রি প্র্যাকটিক্যাল খাতা লিখতে হবে। বাড়িতে পড়ার সময় পাব না।"

সোমদেব বলল, "আমার অসুবিধে নেই। তুই ওপেন কর, আমি এসেই পড়তে শুরু করছি।"

সোম হাত ধুতে চলে গেল হলের মধ্যে। বুড়ো স্টম্যাকটা হাতে নিয়ে বইয়ে কাটা পাকস্থলির ছবিটা দেখে নিল। তারপর ঠিক যেখানে খাদ্যনালীটা পাকস্থলিতে যুক্ত হয়, সেখান থেকে কাঁচি দিয়ে কাটতে শুরু করল। কিন্তু দু-একবার কাঁচি চালাতে গিয়েই বুঝল ব্যাপারটা যত সহজ ভাবছিল, তা নয়। চোপসানো ব্লাডারের মতো স্টম্যাকের পেশী বেশ মোটা পিচ্ছিল এবং শক্ত। হাত থেকে স্লিপ করে যায়। ও একটা বড় কাঁচি বেশ খানিকটা স্টম্যাকের মধ্যে ঢুকিয়ে জোরে চাপ দিয়ে একবারেই দু আড়াই ইঞ্চি কেটে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে দু পাশে পাকস্থলির লালচে থলথলে মাংস ফাঁক হয়ে ঝুলে পড়ল। দেখা গেল কোঁচকানো হড়হড়ে পাকস্থলির ভিতরের পর্দা, আঠালো রসের মতো জলীয় পদার্থ, আর···

মুহূর্তে বুড়োর ভ্রূ জোড়া কুঁচকে দৃষ্টি উজ্জ্বল আর স্থির হল। বুকের মধ্যে কী একটা যেন লাফিয়ে উঠে ক্রমাগত রবারের বলের মতন ড্রপ খেতে লাগল। অসম্ভব চাপা উত্তেজনার মধ্যে ও হাতের কাঁচিটা রেখেই স্টম্যাকের কাটা জায়গার মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে ফাঁক করে ধরল। তারপর মুখ নিচু করে স্থির পাথরের মূর্তির মতন দেখতে লাগল—একটি অজানা অচেনা মৃতদেহের কাটা পাকস্থলির মধ্যে গঁদের আঠার মতো রসের মধ্যে পড়ে রয়েছে একটি ঝকঝকে সোনার হার আর চকচকে আধুলির মতো একটি স্বর্ণমুদ্রা। আলো পড়ে দুটি বস্তুই আগুনের মতো ঝিলিক দিচ্ছে।

একবিন্দু চোখ সরাতে পারল না বুড়ো। চারপাশ যেন অন্ধকার ঢেকে ফেলেছে। ওর বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনে শুধু উজ্জ্বল দুটি বস্তু বিস্মিত জিজ্ঞাসার মতন পাকস্থলির ভিতর থেকে উঁকি দিচ্ছে।

ও বুঝতে পারল না সোমদেব কখন ঘরে এসে ঢুকেছে। সোম কয়েকবার ডাকল, কিন্তু স্ট্যাচুর মতো বুড়োকে বসে থাকতে দেখে এবং কোনো উত্তর না পেয়ে শেষে ঠেলা দিল। "এই বুড়ো, বুড়ো, কী হয়েছে?"

বুড়ো সম্বিত ফিরে পেল। তারপর গভীর ঘুম ভেঙে জেগে ওঠার মতন গলায় বলল, "সোম, দেখে যা। নিচু হয়ে স্টম্যাকের ভেতরটা দ্যাখ।"

"কী ব্যাপার রে, কই দেখি!"

চমকে উঠল সোমদেব। একটু চুপ করে থেকে ভয়ার্ত গলায় জিজ্ঞেস করল, "ও দুটো কী বুড়ো?

বুড়ো গম্ভীর গলায় বলল, "একটা সোনার হার আর একটা মোহর।"

কপালে ঘাম দেখা দিল। মাথা বনবন করে ঘুরতে লাগল দুই বন্ধুর। সেই মুহূর্তে মাথায় এল না, এখন কী করা উচিত।

নিষ্পলক দৃষ্টিতে কাটা পাকস্থলির ভিতর তাকিয়ে চুপচাপ বসে রইল দু'জন।

॥ ২ ॥

ভোরবেলা ঘুম-ঘুম ভাবের মধ্যে ঠাণ্ডায় গা শিরশির করে উঠল সোমদেবের। শরতের সকাল, বাইরে হিম পড়ে এই সময়টা। আমেজের মধ্যে একটা কাঁথা টেনে গায়ে দিতে গিয়েই ঘুমটা পুরো ভেঙে গেল। তাকিয়ে দেখল সকাল হয়েছে। দিব্যি আলো ফুটে গেছে। ঝিরঝির করে ভোরের বাতাস বইছে। জানালার বাইরেই ওদের বাড়ির সংক্ষিপ্ত বাগানে শিউলিফুল ঝরে পড়ে রয়েছে। কয়েকটা পাখি ডাকাডাকি করছে আর ডানা ঝাপটিয়ে ওড়াউড়ি করছে। সেলিমপুরে সোমদের বাড়ির এ-পাশটা এখনও মোটামুটি নির্জন এবং ফাঁকা।

বিছানার ওপর উঠে বসতেই সোমদেবের চোখে পড়ল পাশের খাটে দাদা ঘুমুচ্ছে। আর সেই সঙ্গেই দ্রুত ওর মনে পড়ে গেল গতদিনের সব ঘটনা। চোখের সামনে ভেসে উঠল কাটা স্টম্যাকের চেহারা। ঠিক, ওদের তো কথাবার্তা ঠিক করা আছে আজ তাড়াতাড়ি কলেজে পৌঁছতে হবে। উহ্, ভাবা যায় না কী টেন্‌শন!

স্টম্যাকের মধ্যে সোনার হার আর মোহর দেখার পর মিনিট-পাঁচেক মুখে কারোরই কথা আসেনি। তারপর সোম খুব আস্তে জিজ্ঞেস করেছিল, "বুড়ো, কী করবি এখন?"

"অ্যাঁ!" সোজা হয়ে বসেছিল বুড়ো। তারপর ধীরেসুস্থে খুব সিরিয়াসভাবে বলেছিল, "সেই কথাই ভাবছি। দারুণ ইণ্টারেস্টিং, তাই না? কোথাকার কোন্ ডেডবডি, তার স্টম্যাকের মধ্যে হার আর মোহর! আমি তো কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না, ব্যাপারটা ঘটল কী করে!"

সোমদেব বলেছিল, "কেন, এরকম ঘটতেই পারে। তাড়াহুড়োয় লুকোনোর জায়গা না পেয়ে টপ করে মুখে ফেলে গিলে নিয়েছিল। এরকম ঘটনা আমি আগেও শুনেছি।"

"মাই গড! কী নাস্টি ওয়ে অব হাইডিং!" বুড়ো বলেছিল। তারপর একটু চিন্তা করে আবার বলেছিল, "কিন্তু তার জন্য তো আর মরবে না।' ডেথ্‌টা আনন্যাচারাল নয় তো?"

"সেটা চিন্তার ব্যাপার," সোমদেব বলেছিল। "কিন্তু এখন কী করবি? স্যারকে গিয়ে বলবি?"

"দাঁড়া, দাঁড়া সোম।" বুড়ো স্টম্যাকটা দেখতে দেখতে বলেছিল, "স্যারকে তো যে-কোনো মুহূর্তে বলা যায়। কিন্তু তোর কি মনে হচ্ছে না, এই ব্যাপারটার পিছনে একটা দারুণ মিস্ট্রি রয়েছে। অপরিচিত একটা মহিলার ডেডবডি, তার পেটের মধ্যে সোনার হার আর মোহর, মরে যাওয়ার আগে এগুলো সে কোত্থেকে পেল, কোথায় ছিল! কেন, কীভাবে মরল!"

সোমদেব বলল, "মনে আমার অনেক কিছুই হচ্ছে বুড়ো। কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের বেশি নাড়াচাড়া করতে যাওয়াটা বড্ড বেশি রিস্ক নেওয়া হবে না!"

বুড়োর কপালে দু-একটা চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছিল। বলেছিল, "দ্যাখ সোম, এমন কী রিস্ক! প্রথমত, এটা যে একটা আনক্লেইমড ডেডবডি এ-সম্বন্ধে তো কোনো সন্দেহ নেই।

আমরা পড়ার পরে স্টম্যাকটা যদি ফেলেও দিই, কেউ কি আর খুঁজে পাবে ওটা কোথায় গেল, নাকি জানতে পারবে ওর ভিতরে কী ছিল! এটা একটা অ্যাকসিডেণ্ট যে আমরা হঠাৎ জেনে এবং দেখে ফেলেছি স্টম্যাকের মধ্যে সোনার জিনিস রয়েছে।"

"সেটা ঠিক। কিন্তু বুড়ো, জানা এবং দেখার পর ওটা হ্যাণ্ডওভার করে দেওয়াটাও আমাদের ডিউটি। কেননা, ভুলে যাস না যে-জিনিসগুলো পাওয়া গেছে, সেগুলো আর কিছু না—গোল্ড! সিরিয়াসনেসটা সেই জন্য।"

বুড়ো আস্তে মাথা নেড়েছিল। একটু সময় নিয়ে আবার ভেবে বলেছিল, "কিন্তু আমরা যদি ব্যাপারটা দু-একদিন পরে ডিসক্লোজ করি, তাতে ক্ষতি কী? তোকে সত্যি বলছি সোম, আমার ব্যাপারটা একটু ট্রেস করতে ইচ্ছে হচ্ছে। অফকোর্স তুই রাজি থাকলে।"

"ইচ্ছে আমারও যে করছে না তা নয়। শুধু ভাবছি—"

"তাহলে চেপে যা সোম।" বুড়ো বলে উঠেছিল সোমদেবের কথার মধ্যেই। কাউকে কিচ্ছু বলিস না এ-ব্যাপারে, আমরা যথারীতি পড়ার পর ওটা ট্রেসুদ্ধ আমাদের লকারে তালা দিয়ে রেখে চলে যাব।"

"তারপর?"

বুড়ো খুব উৎসাহ নিয়ে বলেছিল, "অলরেডি আমি সেটা ভাবতে শুরু করেছি। প্রথমে, আমাদের ডিসেকশনের এই ফিমেল বডিটা আইডেণ্টিফাই করতে হবে। সেটাও খুব ইজি

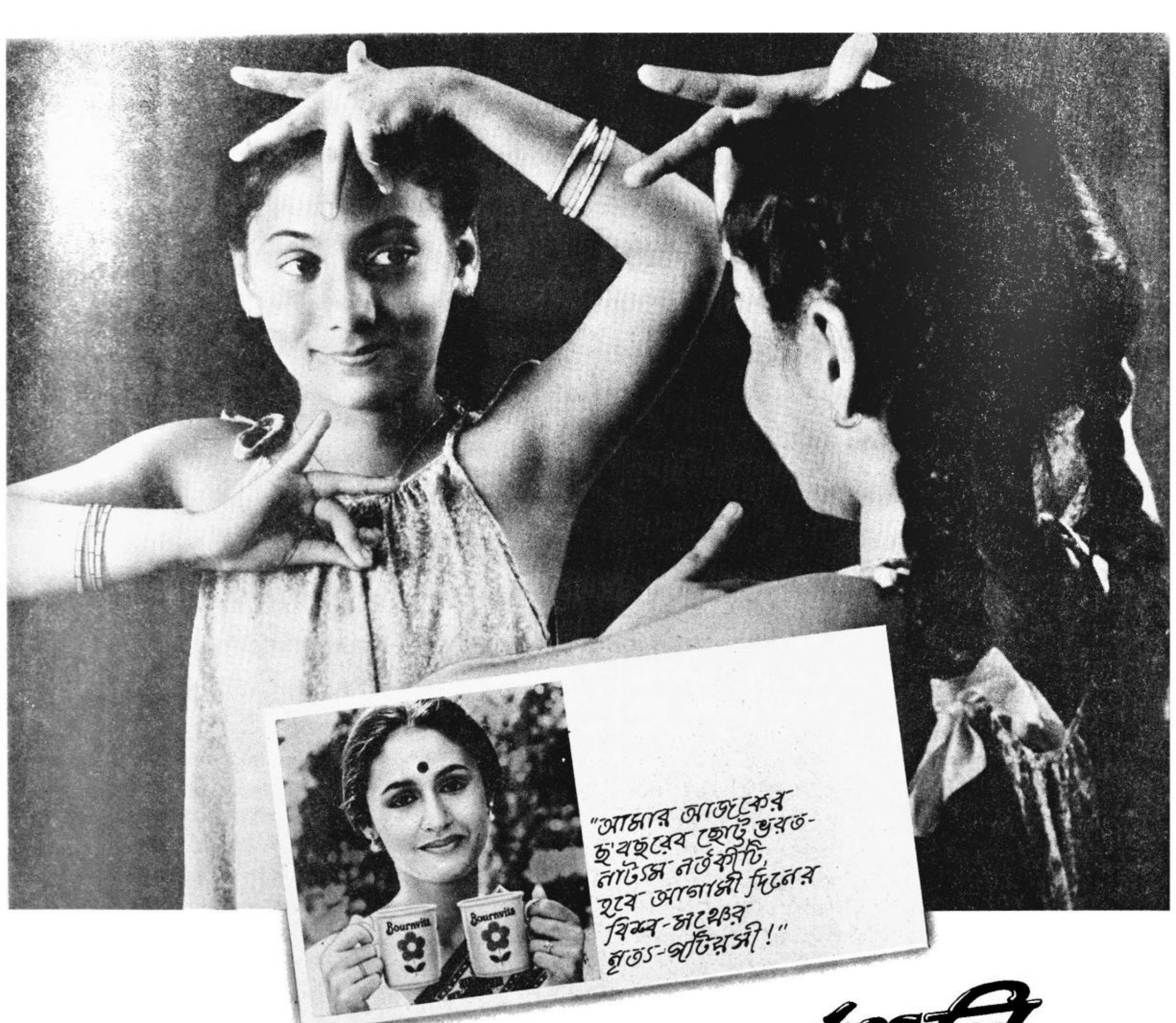

বোর্নভিটাভরা বয়সগুলি

যার জন্যে এরা একদিন আপনাকে জানাবে তাদের কৃতজ্ঞতা।

বাড়ন্ত বাচ্চারা, অন্য আর সব মল্টেড পানীয়ের মধ্যে বোর্নভিটা-ই কেন সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে? কেন পুরুষ ধরে মা বাবারা জোরের সঙ্গেই বলেন তাদের বাচ্চাদের অন্য কোন পানীয়তে কাজ হবে না?

এশুধু এটির মজাদার স্বাদের জন্যে নয়। এমন কি ক্যাডবেরিস্ নামটির জন্যেও নয় এর কারণ অন্য কিছু। বিশেষ কিছু। এ হ'ল বোর্নভিটা, যে পানীয়ের গুণ বলে, তুমি বেড়ে চলো।

ক্যাডবেরিস্
বোর্নভিটা
পালন-পোষণ সঠিকভাবে করুন,
বাচ্চাদের বোর্নভিটা খাওয়ান।

OBM/3783 BEN

নয়। জানতে হবে এই আনক্লেইমড বডি কারা কোত্থেকে অ্যানাটমি ডিপার্টমেন্টকে দিল। তাদের কাছে যাব। যদি কোনো আইডিয়া দিতে পারে—"

"শোন বুড়ো," সোমদেব বলেছিল, "আসলে আমাদের দরকার হেড ডোম ঝগড়ু আর ডিপার্টমেন্টের ক্লার্ক রবিনবাবুর সঙ্গে একটু খাতির জমানো।"

"সেসব কিচ্ছু তুই ভাবিস না," বুড়ো খুশি আর উৎসাহে বলে উঠেছিল। "তুই শুধু হাতটা মেলা। আমার যা একসাইটিং লাগছে না কী বলব!"

হাত মিলিয়ে সোমদেব আবার বলেছিল, "কিন্তু বুড়ো স্ট্রিকট্‌লি মুখ বুজে থাকতে হবে, যাতে কেউ আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ না করে। আর অসুবিধে কিছু বুঝলেই স্যারকে সব জানিয়ে দেব।"

"সে তো বটেই।" বুড়ো বলেছিল। তারপর দুজনে ঠিক করেছিল পরের দিন তাড়াতাড়ি কলেজে এসে ডিসকাস করবে কীভাবে ব্যাপারটা নিয়ে এগোবে।

মশারির মধ্যে বসে কথাগুলো ভাবতে-ভাবতেই সোমদেব ঘড়ি দেখল। প্রায় সাড়ে-ছটা। না, আর দেরি করে লাভ নেই। বুড়োর সঙ্গে ফোনে একবার কথা বলতে হবে। তারপর যে স্টম্যাক নিয়ে আপাতত রহস্য দানা বেঁধেছে, সেই স্টম্যাকের অ্যানাটমিটা গ্রে-র বই থেকে ভাল করে পড়ে নিতে হবে।

হাতমুখ ধুয়ে চা খেয়ে বাইরের ঘরে গেল সোমদেব ফোন করতে। কিন্তু এই সকালে বাবা যে টেলিফোনের সামনে বসে কাগজ পড়বেন এটা ওর মাথায় আসেনি। এখন বাবার সামনে থেকে বুড়োর সঙ্গে ফোনে কথা বলাও যাবে না, আবার ফট করে বেরিয়েও আসতে পারে না। সোমদেবের এই উভয় সঙ্কটের মধ্যেই বাবা ডাকলেন, "কী রে সমু, ফোন করবি?"

কোনো কারণ নেই, তবু বুকের মধ্যে ধক করে উঠল সোমের। বলল, "না। আমি ওই খেলার পাতাটা দেখতে এসেছিলাম। ঠিক আছে পরে দেখব, তুমি পড়ো।"

বাবা আবার ডাকলেন, "কেন, পরে কেন! এই তো নে না তুই খেলার পাতা।"

সোম আর পালাতে পারল না বাবার সামনে থেকে। বাধ্য হয়ে খবরের কাগজ দেখতে শুরু করল। মনে মনে ভাবল, সব কিছু এবার থেকে আগে ভেবে নিতে হবে। বিশেষত বাবার সামনে। কেননা বাবা যে শুধু একজন নামকরা ডাক্তার তাই না, মাঝেমধ্যেই সোমের পড়াশুনোর ব্যাপারে খোঁজখবর নেন। আর এটুকু ভাবতে না ভাবতেই বাবার গলা কানে এল সোমদেবের।

"পড়াশুনো কেমন হচ্ছে?"

কাগজের ফাঁক দিয়ে সোম তাকাল। "হচ্ছে মোটামুটি, খারাপ না।"

খবরের কাগজে চোখ রেখে বাবা আবার জিজ্ঞেস করলেন, "তোদের ডিসেকশন তো শুরু হয়ে গেছে, কেমন লাগছে?"

সোম সচেতন হল। বলল, "ভাল।"

"আজকাল বডির তো খুব স্কারসিটি শুনি। ছেলেরা সব ভাল করে ডিসেকশন করতে পারে?"

খুব সাবধানে সোমদেব উত্তর দিল, "হ্যাঁ, মোটামুটি পারে।"

"কোন্ পার্ট ডিসেকশন করছিস?"

রীতিমত অস্বস্তি বোধ করল সোম। কেন যে আজকেই বাবা ডিসেকশন বডি কোন্ পার্ট ডিসেকশন হচ্ছে এসব জিজ্ঞেস শুরু করলেন কে জানে! অজান্তে বুকের মধ্যে দুবদুব করল ওর। বলল, "অ্যাবডোমেন পেলভিস।" কাগজটা বন্ধ করে ফেলল সোম। বাবা হয়তো আরও কিছু জিজ্ঞেস করতেন, ঠিক এই সময় টেলিফোনটা বাজতে আরম্ভ করল। সোম নিশ্চিন্ত হল। কাগজটা রেখে বেরিয়ে এল বাবা টেলিফোন ধরার মধ্যেই। কিন্তু যাওয়া হল না। দরজার বাইরে পা দেওয়া মাত্র বাবা ডাকলেন, "সমু, তোর ফোন। বুড়ো ডাকছে তোকে।"

বুকের মধ্যে ছ্যাঁত করে উঠল সোমদেবের। কী বিপদেই যে পড়ল সকালবেলা! বাবার সামনে থেকে ঠিকমতো কথাও বলতে পারবে না, আবার চুপ করে থাকাটাও সন্দেহের কারণ হতে পারে। কিন্তু উপায় কী! রিসিভার হাতে নিয়ে উত্তর দিল, "হ্যালো! কে বুড়ো?"

"হ্যাঁ রে, আমি বুড়ো বলছি। আচ্ছা, তোর বাবা সামনে রয়েছেন না?"

মুহূর্তে সোম বুঝল বুড়োটা সত্যি ইন্টেলিজেন্ট। বলল, "হ্যাঁ।"

বুড়ো বলল, "আচ্ছা শোন, আমি তোকে যা যা বলব তুই শুধু শুনে যা। আর হ্যাঁ কিংবা না বলে উত্তর দিবি, বুঝলি?"

"আচ্ছা, হ্যাঁ।" সোম বেশ আশ্বস্ত হল। তাকিয়ে দেখল বাবা মন দিয়ে কাগজ পড়ছেন।

"আজকের দৈনিক বার্তা দেখেছিস?"

"না।"

"তাহলে সেকেণ্ড পেজের নীচের দিকে দেখবি—এক অজানা অচেনা মহিলার মৃতদেহের ছবি আর একটু লেখা আছে। ওটা পড়ে দেখে নিস। কলেজে গিয়ে কথা বলব।"

"আচ্ছা, ঠিক আছে।"

"আর একটা কথা। কাগজটা এক্ষুনি দেখার চেষ্টা করিস না।"

"আচ্ছা।"

"ঠিক আছে ছাড়ছি। অ্যানাটমি ব্লকের সামনে সাড়ে-নটায় দেখা হবে।"

"হ্যাঁ ঠিক আছে। ছাড়ছি।"

সোম টেলিফোন ছেড়ে দিল। দেখল বাবা একমনে কাগজ পড়ছেন। ও চুপচাপ ঘর থেকে বেরিয়ে এল। নিজের ঘরে এসে পড়ার টেবিলে বসে পড়ল সোমদেব। ওপরে শান্তভাব দেখালেও অনুভব করল কী এক অজানা উত্তেজনায় ও রীতিমত অস্থির হয়ে রয়েছে। কোনো সিরিয়াস পড়ায় এই অবস্থায় মন বসানো যায় না। বায়োকেমিস্ট্রি প্র্যাকটিক্যাল-খাতাটা টেনে নিল লেখার জন্য। সেই সঙ্গে উলটো দিকে দাদার টেবিলের দিকে দেখে নিল। দৈনিক বার্তা ডানদিকে দাদার টেবিলে রয়েছে। ইচ্ছে করল তক্ষুনি টেনে নিয়ে দেখে। কিন্তু বুড়োর সতর্ক করাটা মনে পড়ল। তাছাড়া দাদারও নানারকম প্রশ্নের উত্তর দিতে হতে পারে।

একেবারে সাড়ে-আটটার সময় সোমদেব পড়ার টেবিল থেকে উঠল। গায়ের জামা খুলে স্নান করতে যাওয়ার মতো

ভঙ্গি করে ও খুব সহজভাবে দাদার টেবিল থেকে বাংলা কাগজটা টেনে নিল। দাদা সঙ্গে-সঙ্গেই জিজ্ঞেস করল, "কী রে, এত তাড়াতাড়ি উঠে পড়লি যে!"

সোমদেব আর বাসুদেব প্রায় পিঠোপিঠি দুই ভাই। বাসুদেব বটানি নিয়ে পড়ছে। কিন্তু সোমের ওপর খুব দাদাগিরি ফলায় সুযোগ পেলেই। সোম রেগে যায় বটে কিন্তু দাদা আবার খুঁটিনাটি জিজ্ঞাসাবাদ না করলেই সোম ভাবে, দাদা এত চুপচাপ হয়ে গেল কেন! অন্যান্য দিন সোমের কলেজ দশটা কুড়ি থেকে আরম্ভ হয়। ও সওয়া-নটা নাগাদ টেবিল থেকে ওঠে। কিন্তু আজকের প্ল্যান আলাদা। আর সে-সব কথা তো দাদাকে বলা যাবে না। তবে রাগ করাটাও ঠিক হবে না।

সোম কাগজের প্রথম পাতায় চোখ রেখে খুব মোলায়েমভাবে বলল, "আজ একটু তাড়াতাড়ি কলেজ যাব।"

"কেন, দশটা-কুড়ি থেকে তো তোদের ক্লাস। এত তাড়াতাড়ি কী আছে?"

এবার সত্যি সোমের রাগ হল। মনে মনে বলল, তোমার অত খোঁজের কী দরকার! কিন্তু মুখে বলল, "ওই বুড়ো ফোন করেছিল। আমার খাতা থেকে একটা নোট লিখবে। তাই একটু তাড়াতাড়ি যেতে বলেছে।"

দাদা আর কিছু প্রশ্ন করল না দেখে সোম পিছন থেকে মুখ ভেংচে কাগজটা হাতে নিয়ে ঘরের বাইরে চলে গেল। খাওয়ার টেবিলের কাছে গিয়ে দ্রুত দ্বিতীয় পাতাটা খুলে ধরল চোখের সামনে। হ্যাঁ, বুড়ো ঠিক বলেছে। নীচে একেবারে ডানদিকে চারপাশে দাগ দেওয়া ছোট একটা জায়গায় অস্পষ্ট অপরিচ্ছন্ন একটা ছবি। খেয়াল করে দেখলে বোঝা যায়, ওটা কোনো মহিলার ফোটোগ্রাফ। সোম খুব দ্রুত নীচের লেখাটা পড়ে নিল।

> উপরে মুদ্রিত ফোটোগ্রাফটি অজ্ঞাতকুলশীল এক মহিলার। সম্ভবত হিন্দু ও বিবাহিতা। বয়স অনুমান ত্রিশ বছর। গায়ের রঙ শ্যামবর্ণ, চুলের রঙ কালো। উচ্চতা পাঁচ ফুট দু ইঞ্চি। ডান দিকের গালে ও গলায় জন্মদাগ আছে। মাথার পিছনে আঘাতের চিহ্ন এবং বাম কান থেকে রক্তক্ষরণের দাগ আছে। বাম হাতের অনামিকায় একটি শাঁখের আংটি আছে। পরনে হলুদ শাড়ি। বিবরণ অনুযায়ী কোনো সহৃদয় ব্যক্তি ওই মহিলাকে শনাক্ত করতে পারলে অনুগ্রহ করে নীচের ঠিকানায় জানিয়ে বাধিত করবেন।
> —অবৈতনিক সম্পাদক, বঙ্গীয় সৎকার সমিতি।
> ১৮বি, সতীশ পাল স্ট্রিট, কলকাতা ৩৯।

সোমদেব পুরো লেখাটা কয়েকবার মনে মনে আবৃত্তি করে নিল। তারপর দ্রুত নিজেদের ডিসেকশনের বডিটার সঙ্গে মেলানোর চেষ্টা করল। নাহ্, খুব ভাল করে না দেখলে চেনার কোনো উপায় নেই। তা ছাড়া, ইতিমধ্যে কাটাছেঁড়া করে ও বডির যা অবস্থা, আর কিছু উদ্ধার করতে পারা খুব মুশকিল। যাই হোক, দেখা যাবে বুড়ো কী ভেবেছে। অবশ্য ওই ডেসক্রিপশনের সঙ্গে যদি অ্যানাটমি ডিপার্টমেন্টের বডি-রেজিস্টারটা দেখা যায়, তাহলে হয়তো কিছু ক্লু পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সেটা আবার নির্ভর করছে হেড-ডোম ঝগড়ু আর ক্লার্ক রবিনবাবু কিংবা মিউজিয়াম কেয়ার-টেকার মথুরাবাবুর ওপর। নিজের ভাবনার মধ্যেই সচেতন হল সোমদেব। স্নান করতে দেরি হয়ে যাচ্ছে। সাড়ে ন'টার সময় বুড়ো কলেজে চলে আসবে। ও তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকে পড়ল।

॥ ৩ ॥

কলেজের বাস-স্টপে নেমে গেটের দিকে আসতে আসতে সোমদেব দেখতে পেল বুড়ো ঢুকছে। ওর কাঁধে একটা ব্যাগ ঝুলছে। সাড়ে ন'টার দু মিনিট আগেই ওরা অ্যানাটমি ব্লকের ফোয়ারার সামনে মিট করল।

কলকাতার এই মেডিকেল কলেজটাতেই হাসপাতাল আর কলেজ-কম্পাউণ্ড পুরো আলাদা। রাস্তার এপার ওপার। কলেজের মধ্যে তাই হাসপাতালের ভিড়-গন্ধ নেই। বিশাল ছড়ানো জায়গা, মাঝখানে মাঠ। মাঠ ঘিরে বাগান। ডিপার্টমেন্টগুলো সব আলাদা-আলাদা বিল্ডিংয়ে।

সকালের দিকে কলেজে ভিড় কম থাকে। থার্ড ইয়ার থেকে ফিফ্‌থ ইয়ারের ছাত্রছাত্রীরা তখন সব হাসপাতালে থাকে। দশটা কুড়ি থেকে ফার্স্ট আর সেকেণ্ড ইয়ারের ক্লাস শুরু হয়। কলেজি ভিড়টা দানা বাঁধতে থাকে সেই সময় থেকে। বুড়ো আর সোমদেবের যখন দেখা হল, কলেজ তখন একেবারে ফাঁকা বলা চলে। কয়েকজন অধ্যাপকের গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে মাঠের পাশে রাস্তায়। মালীরা তখনও জল দিচ্ছে বাগানের ফুলগাছে লম্বা পাইপ টেনে টেনে। সেকেণ্ড ইয়ারের কয়েকজন ছাত্রীকে ওরা দেখতে পেল ফিজিওলজি ডিপার্টমেন্টের সিঁড়িতে বসে কথাবার্তা বলছে। অ্যানাটমি ডিপার্টমেন্টের সামনে ডোমদের কয়েকটা বাচ্চা ছেলে ঘুড়ি ওড়ানোর চেষ্টা করছে মিছিমিছি। কয়েকটা কুকুর ঘুমুচ্ছে রাস্তার ওপর। ফাঁকা আর নিঝুম ভাব কলেজে।

বুড়ো প্রথমেই বলল, "কাগজটা দেখেছিলি?"

সোমদেব শুকনো ফোয়ারার নিচু পাঁচিলে বসতে বসতে বলল, "হ্যাঁ দেখেছি। কিন্তু ওই ছবি এবং ডেসক্রিপশন আমাদের বডির সঙ্গে মেলানো খুব ডিফিকাল্ট।"

"হ্যাঁ, সে তো বটেই।" বুড়ো বলল, "কিন্তু একটা ব্যাপার, ওই লেখাটা পড়তে পড়তে, সোম, বিদ্যুৎ-চমকের মতো আমার মাথায় হিট করে।"

"কী বল তো?"

বুড়ো নিচু গলায় বলল, "মৃতদেহটার বাঁ হাতের অনামিকায় একটা শাঁখের আংটি ছিল। মনে পড়ছে লেখাটা?"

সোম দু-এক মুহূর্ত চিন্তা করেই বলল, "হ্যাঁ, মনে পড়ছে। আমাদের বডিটায় আছে নাকি!"

"এখন আর নেই। কিন্তু ছিল।" বুড়ো সোমদেবের দিকে ঘুরে বসল।

সোম উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াল। "তুই শিওর।"

"হাণ্ড্রেড পার্সেন্ট। বোস, বলছি।" বুড়ো সোমদেবের হাত ধরে আবার বসিয়ে দিল। তারপর মনে মনে গুছিয়ে নিয়ে বলতে শুরু করল, "ব্যাপারটা পুরো কোয়েন্সিডেন্স। প্রথমদিন আমরা যখন ডিসেকশন করার জন্য হলে গেলাম, দুখিয়া সেই সময় বডি পজিশন করছিল। হল মোটামুটি ফাঁকা। আমি অভিজিৎ শ্যামলী মানস এরকম কয়েকজন দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। তুই তখন স্যারের টেবিলের কাছে ইন্সট্রুমেন্টের

গ্রিজ পরিষ্কার করছিলি। বডিটা খুব স্টিফ হয়ে ছিল। দুখিয়া পা দুটো টেনে উঁচু করে দেওয়ার পর, হাত দুখানা কাঠের ব্লকের ওপর রেখে তালুতে পেরেক ঠুকছিল সোজা করে রাখার জন্য। হঠাৎ দেখলাম ও জাঁতির মতন একটা যন্ত্র দিয়ে বডিটার বাঁ হাতের আঙুল থেকে সাদামতো কী একটা টেনে তুলছে। আর মুখে গালাগালি করে বলছে—'ফাড়নে কে লিয়ে বডি ভেজ দিয়া, আভি তক্ অঙ্গটি নহি টুটা'—বলতে বলতে বাঁ হাতের কড়ে আঙুলের আগেরটা থেকে দুখানা সাদা আংটির টুকরো কটাং করে তুলে ফেলল। আমি এমনিই কৌতূহলবশত একটু কাছে গিয়ে দেখলাম। দুখিয়া তখন ও দুটো নীচে কলাইয়ের বালতির মধ্যে ফেলে দিয়ে আমাদের পরের টেবিলে চলে গেল। আর আমিও ওই সামান্য ব্যাপারটা নিয়ে আর মাথা ঘামাইনি। আজকের কাগজ দেখে আমি জাম্প করে উঠেছি।"

সোমদেব প্রায় দমবন্ধ অবস্থায় এতক্ষণ বুড়োর কথা শুনছিল। বলল, "বডিটা আইডেন্টিফাই করতে এটা কিন্তু একটা পজিটিভ স্টেপ। যদিও স্টম্যাকের মধ্যে হার আর মোহরের রহস্য থেকে আমরা অনেক দূরে, তবু বডির পরিচয় জানতে পারলে আমরা আরও অনেক কিছুর হদিস পাব। তবে বুড়ো, আমাদের কিন্তু খুবই কেয়ারফুল হতে হবে।"

"সে তো বটেই।"

সোম বলল, "ঠিক আছে। চল, তাহলে আর দেরি করে লাভ নেই। ঝগড়ুকে ক্যাচ দিয়ে দেখি যদি হলে ঢোকা যায়। আর শোন, যদি সেরকম সুযোগ হয় বডি রেজিস্টারটাও চেষ্টা করব দেখার। কিছু না কিছু ইনফরমেশন ওটাতেও থাকবে আশা করি।"

দুজনে উঠে বেড়ানোর মতো হাঁটতে হাঁটতে চলল অ্যানাটমি ব্লকের পিছনে ডোম-বস্তিতে। বুড়ো বলল, "আচ্ছা সোম, এখন তো অ্যানাটমি হল্ তালাবন্ধ। ঝগড়ুকে কী অজুহাত দেখাব, কিছু ভেবেছিস?"

সোমদেব বলল, "হ্যাঁ। বলব একটা প্র্যাকটিক্যাল খাতা ফেলে এসেছি। আর ঝগড়ুদা বলে কথা বলব। তা ছাড়া, দু-এক টাকা বখশিশ দেব—সেরকম একটু হিন্ট দেব। ঠিক আছে?"

"বিউটি, বিউটি।" বুড়ো হেসে বলল।

ডোম-বস্তিটা যথারীতি ভীষণ নোংরা। নিচু-নিচু সার দেওয়া ঘরগুলোর মাঝখানে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা। একটা নিমগাছের তলায় দু-তিনটে দড়ির খাটিয়া পড়ে রয়েছে। দেয়ালে এক কোণের দিকে একটা ধাড়ি শুয়োরের সঙ্গে দুটো বাচ্চা শুয়ে রয়েছে। ছোট ঘরগুলোর আনাচে-কানাচে কাঁচা ড্রেন। সেখান থেকে তিন-চারটে বড় আর একপাল খুদে-খুদে মুর্গির বাচ্চা কী সব খুঁটে-খুঁটে খাচ্ছে। ঘরগুলোর মধ্যে রান্না হচ্ছে বোঝা যাচ্ছিল। পেঁয়াজ রসুনের সঙ্গে মেশানো আর একটা বোটকা গন্ধ বেরুচ্ছিল। কয়েকটা ন্যাংটো বাচ্চা ছেলে আর কয়েকটা নেড়ি কুকুর উঠোনটায় খেলা করছে। একটা চটুল হিন্দি গানের সুর ওদের কানে আসছিল। এদিক-ওদিক তাকাতেই দেখল পিছনের দিকে একটা খাটিয়ায় প্রায় ওদের বয়সী একটা ছেলে লুঙ্গি পরে বসে বসে আয়না দেখে লাল চুল আঁচড়াচ্ছে খুব কায়দা করে। ওর পাশেই ট্রানজিস্টর থেকে গানের আওয়াজ আসছে।

সোমদেব সেই ছেলেটাকেই বলল, "আচ্ছা ভাই, ঝগড়ুদা আছে?"

ছেলেটা ওদের দিকে একবার তাকিয়ে দেখল। তারপর সেখান থেকেই হাঁক দিল, "হেই চাচা, বাবুলোগ বোলাওতানি। বাহার আও।"

একটু পরেই দেখল, সিনেমার হিরোইনদের ছবি-সাঁটা একটা নিচু বারান্দা থেকে খালি গায়ে হেলতে দুলতে ঝগড়ু বেরিয়ে আসছে। ওদের সামনে এসে বলল, "কেয়া বাবুজি, বোনস্ লেগা?"

বুড়ো আর সোম দেখল ঝগড়ুর পরনে খাটো ধুতি একটা। চোখদুটো টকটকে লাল। মুখে গন্ধ। নিশ্চয়ই নেশা করে ঘুমুচ্ছিল তখনও। সেই সঙ্গে বুঝতে পারল, ছাত্ররা ঝগড়ুর কাছ থেকে পড়ার জন্য হাড় কেনে বলে, ঝগড়ু ওদের সেই রকম খরিদ্দার মনে করেছে।

সোমদেব বলল, "না ঝগড়ুদা, হাড় তো আমরা আরও পরে কিনব। তোমার কাছে একটা দরকারে এসেছিলাম।" ঝগড়ু মুখ তুলে শুধু তাকাল একবার। ফোলা-ফোলা ঘুম-চোখ। সোম বলল, "ঝগড়ুদা, তোমাকে একটা উপকার করতে হবে। কালকে প্র্যাকটিক্যাল খাতাটা ডিসেকশন হলে ফেলে এসেছি। এখন তো সব বন্ধ, যদি একটু কষ্ট করে খুলে দাও খুব ভাল

নতুন ভোর হল নতুন রোদ উঠল

নতুন সানলাইট
ডিটারজেন্ট পাউডার

আপনার কাপড়ে এনে দেয় রোদের চমক

আপনিও আপনার ঘরে সানলাইটের ঝলমলানি আনুন। নতুন সানলাইট ডিটারজেন্ট পাউডার ওজনে খুব হাল্কা, কিন্তু কাজ দেয় বেশি : দামী পাউডারের মত কাজ দেয়, তবু দাম কম

সানলাইটে একটি এমন উপাদান আছে, যা সাধারণ পাউডারে নেই। এটি কাপড়ের প্রতিটি তন্তু থেকে ময়লা বের করে দিয়ে তাতে চমক নিয়ে আসে।

সানলাইটে না হয় হাতের কষ্ট, না হয় কাপড়ের ক্ষতি। আর এর তাজা মনোরম সুগন্ধ আপনার কাপড়ের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়বে

আপনিও আপনার জীবনে নিয়ে আসুন সানলাইটের চমক। একবার ব্যবহার করে দেখুন—মাত্র ৬ টাকা ৩৫ পয়সায়।

মাত্র
টা.৬·৩৫
(স্থানীয় কর অতিরিক্ত)

আপনার কাপড়ে এনে দেয় রোদের চমক

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

OBM/2568 BEN

হয়। ক্লাসে খাতাটা নিয়ে যেতে হবে।"

ঝগড়ু প্রায় ঝিমোচ্ছিল। বলল, "আখন তো বাবা হমার ডিবটির টাইম না। দো বাদে সে হল খুলবে।"

বুড়ো ফট করে বলল, "সে তো জানি ঝগড়ুদা। আমরা তোমাকে বখশিশ দেব।"

ঝগড়ু আর বিশেষ কিছু বলল না। একটা হাই তুলে ওখান থেকেই ডাকল, "হে ফাগো, ঘর সে চাভি লাও রে।"

যে ছেলেটি খাটিয়ায় বসে চুল আঁচড়াচ্ছিল সেই ছেলেটিই একতাড়া চাবি এনে ঝগড়ুর হাতে দিল। ঝগড়ু বলল, "আসেন দেখি।"

বুড়ো আর সোম মুখ চাওয়াচাওয়ি করে একটু হাসল। তারপর চুপচাপ ঝগড়ুর পিছন-পিছন অ্যানাটমি ব্লকের পিছনের দরজা দিয়ে ডিপার্টমেন্টে ঢুকে পড়ল। নিস্তব্ধ চুপচাপ অ্যানাটমি ডিপার্টমেন্ট। এমন সময়ে ওরা আর কখনও এ-ডিপার্টমেন্টে আসেনি। বিরাট বাড়িটার সব দরজা-জানালা বন্ধ। বিশাল করিডোর আর চওড়া সিঁড়িগুলো পেরিয়ে যেতে যেতে ওরা নিজেরাই নিজেদের পায়ের শব্দ শুনতে পেল। ঘুলঘুলির ফাঁক-ফোকর থেকে কয়েকটা পায়রা ডানা ঝটপট করে উড়ে, অসময়ে তাদের বিরক্ত করার জন্য প্রতিবাদ জানাল। ঝগড়ু সুইচ টিপে একটা আলো জ্বালল। ওদের কানে এল একতলা থেকে কোল্ড স্টোরেজ মেশিনের বিন্‌বিন্ একটানা শব্দ।

তিনতলা ডিসেকশন হলে গিয়ে ঝগড়ু বিশাল তালাটা ঘটাং শব্দ করে খুলল। পাল্লা দুটো ফাঁক করে বলল, "দেখে লিন বাবু, আপনাদের খাতা-উতা কোথায় রাখিয়েছেন।"

ডিসেকশন হলের মাত্র একটা লাইট জ্বেলে দিয়ে ঝগড়ু যেন খুব পরিশ্রান্ত হয়ে গেটের কাছেই একটা টুল নিয়ে বসে পড়ল।

বুড়ো আস্তে বলল, "সোম, চলে আয়, কিচ্ছু ভয় নেই।"

দুজন কাছাকাছি থেকে প্রথমেই ওরা নিজেদের সাত নম্বর বডির কাছে গেল। খুব কাছের থেকে মাথা আর মুখের দিকে দেখল। কপালটা সত্যি ভাল। মুখের বাঁ দিকটা ডিসেকশন করে ফেলেছে সেকেণ্ড ইয়ারের ছেলেরা, কিন্তু ডান দিকটা এখনও অক্ষত। গালের আর গলার কাছে স্পষ্ট জন্মদাগ বুঝতে ওদের কোনো অসুবিধা হল না। বুড়ো ভাল করে দেখাল সোমদেবকে। ফিসফিস করে বলল, "মনে পড়ছে কাগজের ডেসক্রিপশনটা?"

সোম বলল, "ডেফিনিট্‌লি। আর কোনো সন্দেহ নেই। চল, এবার।"

বুড়ো বলল, "দাঁড়া এক মিনিট। আর একটা কাজ আছে।" কথাটা বলেই বুড়ো হঠাৎ নিচু হয়ে টেবিলের তলা থেকে নোংরা ফেলার কলাইয়ের বালতিটা টেনে নিল। তারপর সোমকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই ঘেন্না-গন্ধ সব উপেক্ষা করে দু হাত ঢুকিয়ে দিল বালতিটার মধ্যে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে বুড়ো সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল। দুর্গন্ধে ওর মুখ বেঁকে গেছে, তবু জয়ের হাসি ঠোঁটের কোনায়। সোমের দিকে তাকিয়ে ডান হাত খুলে দেখাল। "এই দ্যাখ সোম, শাঁখের আংটির টুকরো।"

সোমদেব অভিভূত হয়ে গিয়েছিল বুড়োর সাহস আর অনুসন্ধিৎসা দেখে। ইচ্ছে করছিল বন্ধুকে জড়িয়ে ধরতে। বুড়ো তার মধ্যেই শাঁখের আংটির সাদা অর্ধবৃত্ত টুকরো দুটো কাঁধের ব্যাগে চালান করে দিয়ে বলল, "চল। এখানকার কাজ শেষ। কিন্তু সুযোগ যখন রয়েছে আজ দোতলার হলেও ঘুরে যাব। রবিনবাবুর টেবিল থেকে বডি রেজিস্টার খুঁজে পাই কি না দেখি। ঝগড়ু নেশা করে রয়েছে, এর চেয়ে ভাল সুযোগ আর হবে না।"

দরজার কাছে এসে ওরা দেখ ড়ুর রীতিমত নাক ডাকছে। সোম আস্তে ডাকল, "ঝগড়ু ঝগড়ুদা।" ঝগড়ু উঠল। লাল চোখে তাকিয়ে বলল কেয়াজি, খাতা মিলেছে!"

সোম বলল, "ঝগড়ুদা, এখানে তো খুঁজে পেলাম না। বোধহয় দোতলায় ফেলে এসেছি। যদি একটু দোতলাটা খুলে দাও।"

কথার মধ্যেই ঝগড়ু উঠে দরজার তালা আটকে দিল। আর সোম তৎক্ষণাৎ দুটো টাকা ওর হাতে গুঁজে দিল। ঝগড়ু বলল, "চলেন বাবা, চলেন।"

ওরা দোতলায় নেমে এল। ঝগড়ু যথারীতি তালা খুলে গেটের মুখে বসে পড়ল। বুড়ো আর সোমদেব ঢুকে পড়ল হলে। এই হলটা অনেক পরিষ্কার, ছিমছাম, গন্ধও কম। সাধারণত পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ছেলেরা এখানে ডিসেকশন করে। হলটা ছোট, কেননা পার্টিশান দিয়ে ক্লার্ক, আর্টিস্ট, মিউজিয়ামের কিউরেটর, টাইপিস্ট সকলের ঘর বানানো হয়েছে দোতলায়।

বুড়ো পটাপট কয়েকটা আলো জ্বেলে দিল আগে। তারপর সোজা গিয়ে ঢুকে পড়ল রবিনবাবুর পার্টিশান দেওয়া ঘরের মধ্যে। টেবিলের ওপর খাতাপত্র, টাইপ-মেশিন, অ্যাশট্রে, জলের গ্লাস, ফাইল স্তূপীকৃত হয়ে রয়েছে। ওরা দুজনেই ডিসেকশনের বডি-রেজিস্টার খুঁজতে লাগল। নীল রঙের মোটা বাঁধানো একটা খাতা পেয়ে সোম বলল, "বুড়ো, এই যে পেয়েছি।"

চুপচাপ দুজনে পাতা ওলটাতে লাগল। প্রায় মাঝামাঝি এসে বুড়ো চাপা গলায় বলল, "এই যে সোম। আমাদের টেবিলের নম্বর, সাত আর... কিন্তু... এ কী ব্যাপার!"

ওরা দেখল, অন্যান্য সব টেবিলের বডি সম্বন্ধেই কিছু না কিছু খবরাখবর লেখা আছে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার ওদের বডিটার ক্ষেত্রে প্রায় কিছুই লেখা নেই। শুধু কয়েকটা এম, পি, সি, কে... এই রকম সব সাংকেতিক অক্ষর। বুড়ো আর সোমদেব পরস্পরের দিকে অবাক চোখে তাকাল। বুড়ো খুব দ্রুত পকেট থেকে একটা কাগজ নিয়ে অক্ষরগুলো লিখে নিল। খাতাটা আবার যথাস্থানে রেখে দুজনে বেরিয়ে এল। সোম দেখল বুড়োর মুখ খুব গম্ভীর, ভ্রূ দুটো কোঁচকানো।

গেটের কাছে এসে সোম ঝগড়ুকে বলল, "ঝগড়ুদা, থ্যাঙ্ক য়্যু। পেয়েছি।"

চুপচাপ অ্যানাটমি ব্লকের সেই পিছনের দরজা দিয়েই দুই বন্ধু নেমে গেল। বুড়ো কব্জি উলটে ঘড়ি দেখল। দশটা পঁচিশ। সোম বলল, "আজকের কেমিস্ট্রি ক্লাসটা আর করা হল না। চল, ক্যান্টিনে যাই।"

বুড়ো আস্তে হাঁটতে হাঁটতে শুধু বলল, "হ্যাঁ, চল্।"

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

ধাঁধা

"এবারের ধাঁধাটা শুনতে শক্ত, কিন্তু উত্তর মেলানো মোটেই কঠিন নয়।" ছোট্‌কা বলল।

সামনে রয়েছে মোটা, বাঁধানো সেই খাতাটা, যার মধ্যে ছোট্‌কা নানান মজার ধাঁধা লিখে রাখে। ছোট্‌কা সেই খাতাটা হাতে তুলে নিল. তারপর আবার বলল, "আমার মনে হয়, উত্তরটা মুখে-মুখেই হয়ে যাবে। কাগজ-কলম নিয়ে বিরাট-বিরাট অঙ্ক কষার দরকার নেই।"

তার মানে, ধাঁধাটায় অঙ্ক রয়েছে। ছোট্‌কার কথা শুনে আমি বুঝতে পারি। কিন্তু ধাঁধাটা লিখতে গিয়ে মনে হল, যত কঠিনই শোনাক না কেন, কোথায় যেন একটা সোজা ব্যাপারও লুকিয়ে রয়েছে ধাঁধাটায়। সেটা ধরতে পারলেই জট খুলে যাবে। আমি চেষ্টা করছি। তোমরাও করো। তবে হ্যাঁ, মুখে-মুখে উত্তর বার করতে হবে, এটাই ছোট্‌কার শর্ত।

প্রথম ধাঁধা ॥ ধাঁধাটা হল, হাতে বালা পরা নিয়ে। সাঁওতাল পরগনার একটা গ্রামে ৮০০ জন মহিলার বাস। এঁদের মধ্যে শতকরা তিনজন এক হাতে একটা করে বালা পরেন। অন্য হাত খালি থাকে। অবশিষ্ট সাতানব্বই শতাংশের অর্ধেক দু-হাতে দুটো করে বালা পরেন, অর্ধেক কোনো হাতেই বালা পরেন না।

এই হল তথ্য।

এবার বলতে হবে, সব মিলিয়ে কটা বালা ব্যবহার করেন ওই গ্রামের মহিলারা? বলতে হবে খুব চটপট।

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ কোন্ চেনা ইংরেজি শব্দে আটটা অক্ষর, আর সেই আট অক্ষরের মধ্যে একটিমাত্র ভাওয়েল?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ জট ছাড়াও—র্চ লা র ঙ্গ ম ণ

গতবারের উত্তর ॥ (১) আধ ঘণ্টা বাদে মুখোমুখি হবে সন্ধ্যা ও উষা ওই আধ ঘণ্টায় পাখিটা উড়বে ২২ কিঃ মিঃ। (২) প্রত্যেকটা নামই উল্টো দিক থেকে পড়া যায়। অপরিবর্তিত থাকে উল্টো দিক থেকে পড়লেও। (৩) ২০০ হয়।

সত্যসন্ধ

শব্দ-সন্ধান

১		২	■	৩		৪
	■	৫	৬		■	
৭	৮	■		■	৯	
■	১০					■
১১		■		■	১২	১৩
	■	১৪		১৫	■	
১৬			■	১৭		

সংকেত: পাশাপাশি: (১) বুকের খাঁচা। (৩) শপথ। (৫) প্রাচীন ভারতের একটি নগরী। (৭) গঙ্গাপুত্র আট গণদেবতা। (৯) কৃষ্ণপক্ষের শেষ তিথি। (১০) ইন্দিরাকে তাঁর বাবা চিঠিতে যে-নামে সম্বোধন করতেন। ১১) দেব-দেবী বা প্রিয় নেতার উদ্দেশে যে-ধ্বনি দেওয়া হয়। (১২) দেবগুরুর পুত্র, দৈত্যগুরুর শিষ্য। (১৪) যেখানে ত্রিবেণী-সংগম হয়েছে। (১৬) দুয়ার। (১৭) তিলফুলের মতো তিলকফোঁটা।

উপর-নীচ: (১) প্রাচীন পারসীক জাতি। (২) সূর্য। (৩) চাবুক। (৪) মাহাত্ম্য। (৬) উদারহৃদয়। (৮) অত্যন্ত প্রিয়। (৯) সৈন্যদল। (১১) ঘাতক। (১৩) সুতো কাটার যন্ত্র। (১৪) দেশের জনসাধারণ। (১৫) গমন।

রঞ্জন

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

যা	যা	ব	র	■	রা	হা
জ্ঞ	■	■	সু	■	জা	তি
সে	■	শ	ল	ভ	■	■
নী	লা	ম্বু	■	র	ঙ্গ	ন
■	■	ক	রা	ত	■	ভ
মৃ	গ	■	তু	■	■	শ্চ
দু	ল	■	ল	ম্বো	দ	র

মজার খেলা

দশটা দেশলাইকাঠি কিংবা টুথপিক, যেটা যোগাড় করা সহজ হয়, যোগাড় করো।

এবার কাঠিগুলোকে নীচের ছবির মতো করে টেবিলের উপর সাজাও—

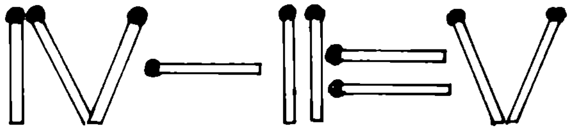

কী ভাবছ ? ভুল অঙ্ক লেখা হল, এই তো ?

হ্যাঁ, অঙ্কটায় সত্যিই ভুল রয়েছে। চার থেকে দুই বিয়োগ করলে পাঁচ হয় না। সেইখানেই তো খেলাটা।

আসলে, এটাকে একটা ঠিক অঙ্কের চেহারা দিতে হবে। একটিমাত্র কাঠি তুলে নিয়ে ফের এমনভাবে বসাতে হবে যে, টেবিলে একটা ঠিক-ঠিক অঙ্ক দেখা যাবে।

সেটাই হল, মজার খেলা।

এটা কিন্তু তোমাদেরই করার জন্য দেওয়া। বন্ধুদের দেখাবে কি না সে-সব কথা পরে। আগে নিজেরা করো।

করেছ ? খুব ভাল। যারা পারলে না, তাদের দুয়ো। এবার মিলিয়ে নাও নীচের উত্তরের সঙ্গে—

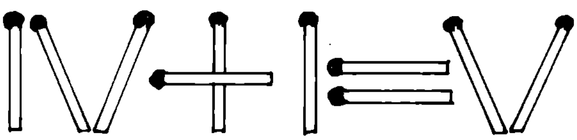

কী, অঙ্ক মিলেছে ? এবার তাহলে বন্ধুদের দেখাও। দেখবে কেমন মজা হবে।

মজারু

উত্তর বটে

প্রঃ তোমার ভাই ৬ সেকেণ্ডে ১০০ মিটার দৌড়েছে, এটা কী করে সম্ভব। ওয়ার্ল্ড রেকর্ডই তো ৯ সেকেণ্ডের বেশি ?

উঃ একটা শর্টকাট রাস্তা আছে, সেটা আমার ভাই আগেই চিনে রেখেছিল।

প্রঃ মৃত্যুর আগেই ধর্মান্তর গ্রহণ করে কী লাভ হবে ?

উঃ একজন বিধর্মী মারা যাবে।

প্রঃ তুমি ভারতবর্ষে জন্মেছ, তা তো বুঝলাম, কিন্তু কোন্ অংশে ?

উঃ আজ্ঞে আমার পুরোটাই ভারতবর্ষে জন্মেছে।

সুসেন

হাসিখুশি

"দু-একখানা উপহার দেবার মতো বই দেখান তো।"

"কী বই চান, হালকা ধরনের ?

"ওজনে কিছু যায়-আসে না, সঙ্গে গাড়ি আছে।"

"ড্রয়ারে অতগুলো টাকা-পয়সা রেখে এলে, চাবি দিয়ে এসেছ তো ?"

"তুমি তো আমার চোখের সামনেই আছ। তাহলে আর চাবি দেবার দরকার কী ?"

"সেদিন চিড়িয়াখানায় ওরান উটাংয়ের খাঁচার সামনে যেতেই আমার জামা ধরে টানতে শুরু করল ওরান উটাংটা। এর কারণ কী বলতে পারো ?"

"কারণটা খুবই সহজ। তোমার সঙ্গে ওর মুখের মিল ছিল নিশ্চয়ই।"

"আমার জুতোর দোকান থেকে গত চারদিনে একজোড়া জুতোও বিক্রি হয়নি। কী করা যায় বলুন তো ?"

"রোজ একজোড়া করে জুতো আপনি নিজেই পরুন না।"

ছবি : অহিভূষণ মালিক

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সদাশিব হৈ হৈ কাণ্ড চিত্রনাট্য : তরুণ মজুমদার ছবি : বিমল দাস

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ছবি এঁকেছে **মানসী ঘড়াই** (বয়স ১৩)

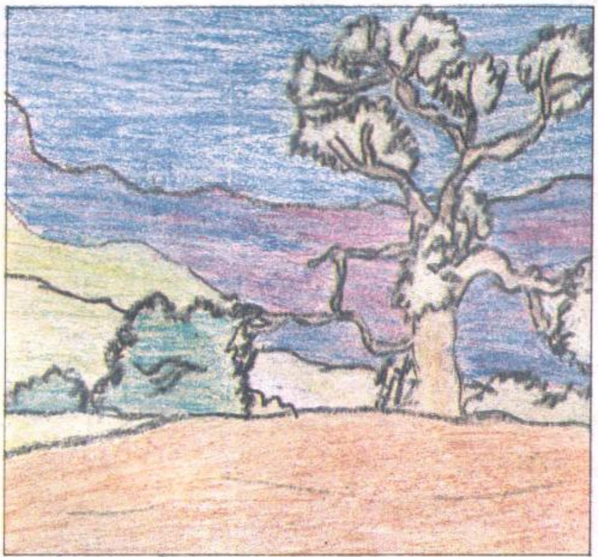

ছবি এঁকেছে **অনির্বাণ দত্ত** (বয়স ১০)

ছবি এঁকেছে শৈবাল বন্দ্যোপাধ্যায় (বয়স ১১)

পুতুলের জগৎ

টায়রার একটি ছোট্ট খেলার ঘর আছে। সেখানে কত খেলনা। সকলে জানে যে, রাত্রিবেলা পুতুলরা জ্যান্ত হয়ে ওঠে, কিন্তু সে-কথা টায়রাদের বাড়ির কেউ জানে না।

সেদিন রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পরে বুড়ো পুতুলটা বেরিয়ে এসে রাঁধুনি বুড়িকে বলল, "আমার খিদে পেয়েছে।"

বুড়ি অমনি তেড়ে এল। ওদিকে শোবার ঘরে বড়, মেজো, সেজো পুতুল ঘুম থেকে উঠেই ঝটাপটি লাগিয়ে দিল। কেবল শান্ত-শিষ্ট সবচেয়ে ছোট পুতুলটা চুমকির শাড়িপরা বউ-পুতুলের পাশে বসে বই পড়তে লাগল।

শোবার ঘরে মেমসাহেব ঘুম ভেঙে উঠেই 'বেড টি এখনো হল না' বলে চাদর-ঢাকা দিয়ে আবার শুয়ে পড়ল। আর তক্ষুনি জাপানি-পুতুল পাখার হাওয়া খেতে খেতে বেরিয়ে এসে বউ-পুতুলের সঙ্গে গল্প করতে লেগে গেল। বড়, মেজো, সেজো পুতুলের মারামারি তখনও থামেনি। একজন ফুলদানি উলটে ফেলে তো আর একজন পর্দা ছিঁড়ে দেয়। এইবার সবচেয়ে ছোট পুতুলটা উঠে গিয়ে পাশের ঘরে তার প্রিয় বন্ধু টিনার সঙ্গে খেলতে বসল। অন্যরাও এসে খেলতে বসে গেল।

ঘরের মাঝখানে টেডি বিয়ার, ডোনাল্ড ডাক, ভেউ-ভেউ কুকুর খুব চেঁচামেচি করছে প্যানকেক ভাল না পুডিং ভাল তাই নিয়ে। রান্নাঘরে রাঁধুনি মাংস চড়িয়েছে স্টোভে। মেমসাহেব ঘুম থেকে উঠে মুখ ধুয়ে আয়নার সামনে এসে কায়দা করে সোনালি চুল আঁচড়াচ্ছে। ঘরের একধারে জোকার ড্রাম বাজাচ্ছে, বেড়াল কাঁসর বাজাচ্ছে

আস্তে আস্তে সকাল হয়ে গেল। টায়রা খেলার ঘরে ঢুকে দেখে যে, চারদিক লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে। ইঁদুরের কাজ ভেবে সে গেল মায়ের কাছে নালিশ করতে। আসলে, টায়রা তো আর জানে না কী হয় রাতের বেলা!

শ্বেতা নন্দী (বয়স ১১)

পুরনো বন্ধুরা

আমি আমার বাবা-মায়ের সঙ্গে মুর্শিদাবাদে থাকতাম। সেখানকার স্কুলে আমার বাবা কাজ করতেন। আমাদের বাড়িটা ছিল একটা মাঠের ভেতরে। সেই মাঠে আমি আমার বন্ধুদের সঙ্গে খেলতাম। ওখানে আমার অনেক বন্ধু ছিল। বাপ্পাদাদা, পপিদিদি, বাচ্চুদাদা, সোনালি—আরও অনেক বন্ধু ছিল।

এখন আমরা চন্দননগরে থাকি। কিন্তু পুরনো বন্ধুদের জন্যে আমার মন খারাপ করে। মনে হয়, আবার সেইসব বন্ধুর কাছে ফিরে যাই।

ফাল্গুনী ঘোষ (বয়স ৭)

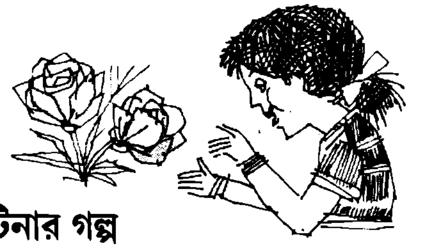

টুয়া ও টিনার গল্প

টুয়া নামে একটি মেয়ে ছিল। তার ছিল একটা ফুলের বাগান। ফুলের বাগানে অনেক ফুলগাছ ছিল।

টুয়া রোজ বিকেলে ফুলের বাগানে জল দিত। তার সবচেয়ে প্রিয় ফুল ছিল গোলাপ। একদিন গোলাপগাছে জল দিতে গিয়ে এক আশ্চর্য জিনিস দেখল সে। এক ফুলপরি গোলাপফুলের সঙ্গে কথা বলছে। তখন টুয়ার দুঃখ হল, গোলাপফুল তো তার সঙ্গে কথা বলে না।

ফুলপরির সঙ্গে আলাপ করল টুয়া। ফুলপরির নাম টিনা। সে থাকে গোলাপফুলের মধ্যে। টুয়া টিনাকে বলল, "আমাকে ফুলের মধ্যে নিয়ে যাবে।"

টিনা বলল, "বেশ, তুমি চোখ বুজে থাকো। যখন আমি খুলতে বলব, তখন খুলবে, তার আগে না।"

ওর কথামতো টুয়া চোখ বুজল। একটু পরে চোখ খুলে দেখল, সে একটা সোনার ঘরে দাঁড়িয়ে আছে। দুই বন্ধু সেই ঘরে গল্প জুড়ল।

হঠাৎ কে যেন ধাক্কা দিল টুয়াকে। টুয়া দেখে ওর মা। মা হাসতে হাসতে বললেন, "তুই সেই থেকে ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে বকবক করে যাচ্ছিস, স্বপ্ন দেখছিলি বুঝি?"

মায়ের কথায় টুয়া ভীষণ অবাক হয়ে গেল।

গার্গী সেনগুপ্ত (বয়স ৮)

কমলালেবুর পাঁচটি বীজ

সার আর্থার কোনান ডয়েল

আগে যা ঘটেছে : সেপ্টেম্বর মাসের এক প্রবল ঝড়জলের সন্ধেবেলা হোমস আর ওয়াটসন বেকার স্ট্রিটের ঘরে বসে ছিলেন, এমন সময় জন ওপ্‌নশ ঘরে ঢুকলেন। ওপ্‌নশ এসেছেন হোমসের সাহায্যপ্রার্থী হয়ে। ওপ্‌নশয়ের কাহিনীর সূত্রপাত তাঁর কাকার আমেরিকায় থাকবার সময় থেকে। কাকা আমেরিকা থেকে ফিরে এসে ইংল্যাণ্ডের পাড়াগাঁয়ে নির্জনে জীবন যাপন করতেন। হঠাৎ কে বা কারা খামের মধ্যে কমলালেবুর পাঁচটি বীজ পুরে তাঁর নামে পাঠালে। ...

॥ ২ ॥

"খাম থেকে কমলালেবুর শুকনো বীজ ঝরে পড়তে দেখে আমার বেদম হাসি পেল। কিন্তু কাকার মুখের দিকে তাকিয়েই শুকিয়ে গেল আমার হাসি। মুখটা হাঁ হয়ে রয়েছে। চোখ দুটো যেন এক্ষুনি ঠেলে বেরিয়ে আসবে। আমার মনে হল, হঠাৎ কোনো জাদুমন্ত্রে তাঁর শরীর থেকে এক মুহূর্তে সমস্ত রক্ত যেন কেউ শুষে নিয়েছে। কাকার মুখের রঙ কাগজের মতো সাদা। এক দৃষ্টিতে খামটার দিকে তিনি তাকিয়ে আছেন। খামটা তাঁর হাতের মধ্যেই ধরা ছিল। অবাক হয়ে দেখলুম, তাঁর হাতটা থরথর করে কাঁপছে। আমার মনে হল, সব কিছু যেন ভুলে গেছেন তিনি, কোনোদিকে তাঁর খেয়াল নেই। সেই অবস্থায় হঠাৎ তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'K K K .... ওহ্ ভগবান! এত দিন পরে আমার দেনা শোধের সময় হল!'

"'এ সব তুমি কী বলছ কাকা?' আমি না বলে থাকতে পারলুম না।

"'আমার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে' বলতে বলতে কাকা খাবারঘরের টেবিল থেকে উঠে পড়ে নিজের ঘরের দিকে গেলেন।... বিশ্বাস করুন মিঃ হোম্‌স একটা অজানা ভয় আর আশঙ্কায় আমি যেন কেমন হয়ে গেলুম। কাকা ঘর থেকে চলে যাবার পরে আমি খামটা তুলে নিলুম। দেখলুম খামের যে দিকটায় আঠা লাগানো থাকে সেই দিকে এক কোণে লাল অক্ষরে তিনটে বড় হাতের অক্ষর লেখা। খামটার মধ্যে ঐ শুকনো বীজ পাঁচটা ছাড়া আর কোনো চিঠিপত্র নেই। আমি বুঝতে পারলুম না যে এই সামান্য ব্যাপারে কাকার এত বেশি ভয় পাবার কী কারণ থাকতে পারে।

"খাবার-ঘর থেকে বেরিয়ে আমি যখন দোতলায় উঠছি তখন সিঁড়িতে কাকার সঙ্গে দেখা হল। কাকা ওপর থেকে নামছেন। কাকার এক হাতে একটা মরচে-ধরা চাবি আর এক হাতে একটা ছোট বাক্স, দেখতে অনেকটা ক্যাশবাক্সের মতো। চাবিটা দেখেই আমার মনে হল এটা নিশ্চয়ই চিলেকোঠার চাবি।

"উত্তেজিতভাবে কাউকে শাপশাপান্ত করতে করতে কাকা বললেন, 'ওরা যা পারে করুক গে। ঠিক আছে আমিও ওদের এইসা প্যাঁচে ফেলব যে বাছাধনরা টের পাবে।...জন, মেরিকে বলো সে যেন এক্ষুনি আমার ঘরের ফায়ারপ্লেসে বেশ গনগনে করে আঁচ দিয়ে দেয়। আর হর্শ্যামে গিয়ে ফোর্ডহ্যাম-উকিলকে বলে এসো তার সঙ্গে আমার বিশেষ প্রয়োজন, সে যেন আজই আমার সঙ্গে দেখা করে।'

"আমি কাকার কথামতো কাজ করলুম। উকিল যখন এসে হাজির হল তখন কাকা আমাকে তাঁর ঘরে ডেকে পাঠালেন। ঘরে ঢুকতেই নজরে পড়ল ফায়ারপ্লেসে দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলছে। ফায়ারপ্লেসের লোহার শিকগুলোর ওপর স্তূপাকার ছাই আর টুকরো-টুকরো পোড়া কালো কাগজ। আরো লক্ষ করলুম যে, ফায়ারপ্লেসের একধারে সেই তামার বাক্সটা খোলা। বাক্সটা একদম খালি। সেই বাক্সটার দিকে ভাল করে তাকাতে দেখতে পেলুম বাক্সটার ওপরে তিনটে K অক্ষর লেখা। ঠিক যেমন হরফের তিনটে K আমি খামের মধ্যে লেখা দেখেছিলুম।

"কাকা আমাকে বললেন, 'জন, আমার ইচ্ছে যে তুমি আমার এই উইলের প্রধান সাক্ষী হও। আমার সমস্ত সম্পত্তি এর দায়দায়িত্ব ভাল-মন্দসমেত সব কিছু আমি আমার দাদা তোমার বাবাকে দিয়ে গেলুম। আমি আশা করি যে, একদিন তোমার বাবা এই সম্পত্তি তোমাকেই দিয়ে যাবেন। তুমি যদি নিরুপদ্রবে, সুখে-স্বচ্ছন্দে এই সম্পত্তি ভোগ করতে পারো তো অতি উত্তম। তবে তা যদি না পারো তবে এই সম্পত্তি তোমার সবচেয়ে যে বড় শত্রু তাকে দান করে দিও। আমার এই উপদেশটি মনে রেখো, ভুলো না। তোমাকে এই রকম একটা ঝঞ্ঝাটের মধ্যে ফেললুম বলে আমার নিজের খুবই খারাপ লাগছে। তবে শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা কোন্ দিকে গড়াবে তা তো আমি জানি না। আশা করতে দোষ নেই যে, সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবে। এখন লক্ষ্মীছেলের মতো এই কাগজের যেখানে ফোর্ডহ্যাম সই করতে বলছে সেখানে নাম সই করে দাও।'

"ফোর্ডহ্যাম যে জায়গাটা দেখিয়ে দিলেন আমি সেইখানে সই করে দিলুম। তারপর সেই সব কাগজপত্র নিয়ে ফোর্ডহ্যাম তো চলে গেলেন। কিন্তু সেদিন সকাল থেকে যে-সব অসম্ভব কল্পনার অতীত ঘটনা ঘটে গেল সেগুলো আমার মনের ওপর মস্ত একটা ছাপ ফেলল। আমি সকাল থেকে যা-যা ঘটেছে সব মনে মনে নাড়াচাড়া করতে লাগলুম। কিন্তু এই ব্যাপারের মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলুম না। কেবল কেমন একটা অজানা ভয়, একটা বিপদের চিন্তা আমার মনকে আচ্ছন্ন করে রাখল।

"যাই হোক, একটা দুটো করে বেশ কয়েকটা সপ্তাহ কেটে গেল। ইতিমধ্যে অবশ্য কোনো গোলমাল হয়নি। আস্তে আস্তে সেই অজানা ভয়ের গা-ছমছমানি ভাবটা কমে এল বটে, কিন্তু সেই ভাবটা মন থেকে একদম মুছে গেল না। এই রকম একটা অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে আমাদের দিন কাটতে লাগল। বাইরে থেকে কোনো কিছুই বদলাল না। কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পারছিলুম যে, আমার কাকা ভেতরে-ভেতরে কেমন

যেন বদলে যাচ্ছেন। তিনি আমাদের সঙ্গে মেলামেশা, কথাবার্তা বলা একদম বন্ধ করে দিয়ে প্রায় সব সময়েই নিজের ঘরে খিল লাগিয়ে একলা বসে থাকতেন। অবশ্য এক-একদিন খুব উত্তেজিত অবস্থায় তিনি একটা পিস্তল হাতে নিয়ে ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে আসতেন। সেই সময়ে তিনি পাগলের মতো চিৎকার করে যা বলতেন তার সারমর্ম হল যে, এ-পৃথিবীতে তিনি কাউকে ভয় করেন না। কারুর ভয়ে তিনি জন্তুর মতো চব্বিশ ঘণ্টা তাঁর ঘরের ভেতর বন্দী থাকতে পারবেন না। 'মানুষ দানব ভূতপ্রেত কাউকেই আমি পরোয়া করি না' বলে তিনি আমাদের বাড়ির বাগানে আর মাঠে খুব খানিকটা হাঁটাহাঁটি করতেন। কিছুক্ষণ পরেই সেই উত্তেজনার ভাবটা কেটে গেলে তিনি দৌড়তে-দৌড়তে বাড়ির মধ্যে ঢুকে দুমদাম করে সব দরজার খিল লাগিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে পড়তেন। আমরা শুনতে পেতুম যে তিনি তাঁর ঘরের দরজায় চাবি দিয়ে দিচ্ছেন। সেই সময়ে তাঁকে দেখলে মনে হত যে তাঁর মনের মধ্যে ভয়ের ফাঁসটা তাঁকে এতই চেপে ধরছে যে তিনি আর সেটা সহ্য করতে পারছেন না। তাঁর দমবন্ধ হয়ে আসছে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডার দিনেও দেখতুম যে তাঁর শরীর দরদর করে ঘামছে।

"যাক্ আমার কথা আর বেশি বাড়াব না। এইবার আসল কথায় আসি। একদিন রাত্রে কাকা তাঁর সেই উত্তেজিত অবস্থায় বাগানে পায়চারি করতে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু আর তিনি ফিরে এলেন না। মানে তাঁকে আমরা আর জীবিতাবস্থায় দেখিনি। অনেক রাত্রি পর্যন্ত কাকা ফিরছেন না দেখে আমরা মানে আমি আর চাকরবাকররা কাকার খোঁজ করতে গেলুম। আমাদের বাগানের এক কোণে একটা ছোট ডোবা আছে। খুঁজতে খুঁজতে আমরা দেখতে পেলুম যে সেই ডোবাটার মধ্যে কাকা উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছেন। তাঁর দেহে প্রাণ নেই। তবে সেখানে কোনোরকম ধস্তাধস্তি, মারামারি কিংবা শারীরিক বল প্রয়োগের লেশমাত্র চিহ্ন নেই।

"যথারীতি পুলিশে খবর দেওয়া হল। পুলিশ এল। সব দেখেশুনে পুলিশ সিদ্ধান্ত করলে যে, কাকা মনের অশান্তি সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছেন। পুলিশের এই সিদ্ধান্ত আমি মেনে নিতে পারলুম না। কেননা, কাকা যে শুধু মরতে ভয় পেতেন তাই নয়, তিনি বাঁচতে চাইতেন। যাই হোক, সব চুকেবুকে গেল। আমার বাবা কাকার সব সম্পত্তির মালিক হলেন। দেখা গেল, ঘরবাড়ি জায়গাজমি ছাড়াও ব্যাঙ্কে কাকার নগদ চোদ্দ হাজার পাউণ্ড জমা আছে।"

ওপনশকে বাধা দিয়ে হোম্‌স বললে, "এক মিনিট! আপনার কথা যতটুকু শুনলুম তাতেই আমার ভীষণ কৌতূহল হচ্ছে। এরকম অদ্ভুত ঘটনার কথা আমি এর আগে সত্যি কখনও শুনিনি। তাই সব ব্যাপারটা আমি ভাল করে বুঝে নিতে চাই। আপনার কি মনে আছে যে, আপনার কাকা প্রথম চিঠিটা ঠিক কত তারিখে পান? আর কত তারিখে তিনি পুলিশের কথামতো আত্মহত্যা করেন?"

"চিঠিটা এসেছিল ১০ মার্চ '৮৩। আর এই চিঠিটা পাবার ঠিক সাত সপ্তাহ পরে কাকার মৃত্যু হয়। দোসরা মে তারিখের রাত্রে।"

"ঠিক আছে। আপনি বলুন।"

"তারপর আমার বাবা তো হর্শ্যামে কাকার বাড়িতে চলে এলেন। একদিন আমি বাবাকে ওই চিলেকোঠাটা ভাল করে দেখতে বললুম। চাবি খুলে ঘরে ঢুকতেই আমাদের নজরে পড়ল সেই তামার বাক্সটা। বাক্সর ডালাটা তুলতেই দেখতে পেলুম ভেতরে রয়েছে একটা ছোট কাগজ। কাগজটার একপিঠে লেখা রয়েছে K K K আর তার নীচে লেখা রয়েছে চিঠিপত্র, রসিদ, তালিকা ইত্যাদি। আমরা বুঝতে পারলুম যে, ওই ফর্দে যা লেখা রয়েছে সেই সব জিনিস মানে চিঠিপত্র, রসিদ, তালিকা সব ওই বাক্সে ছিল। আর ওই কমলালেবুর বীজ পাওয়ার ফলেই কাকা ওই কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলেন। ওই বাক্সটা ছাড়া ওই ঘরে আর যা ছিল তা হল কিছু টুকরো কাগজ আর কয়েকটা ডায়েরিজাতীয় 'নোটবুক'। ওই সব নোটবুকে কাকার আমেরিকার সব অভিজ্ঞতার কথা লেখা। কয়েকটা খাতায় শুধু যুদ্ধের কথাই লেখা ছিল। সেগুলো যে কোনো লোক পড়লেই বুঝতে পারবে যে, কাকা অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ অফিসার ছিলেন। বীর যোদ্ধা বলে তাঁর খুব নামও হয়েছিল। আর কয়েকটা খাতায় যুদ্ধের পরেরকার কথা লেখা ছিল। সেই খাতায় কেবলই রাজনীতির কথাবার্তা লেখা। বুঝতে পারলুম যে, কাকা রাজনীতির দলাদলিতে বেশ ভালভাবেই জড়িয়ে পড়েছিলেন। কাকার ডায়েরিতে উত্তরাঞ্চলের নেতাদের সম্বন্ধে বেশ কড়া-কড়া সব মন্তব্য লেখা আছে। সে সময় আমেরিকার উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে দক্ষিণাঞ্চলের নেতাদের ঝগড়াঝাটি চরমে উঠেছিল।

"৮৪ সালের গোড়ার দিক থেকে আমার বাবা পাকাপাকিভাবে হর্শ্যামে বাস করতে শুরু করেন। একটা বছর বেশ ভালভাবেই কাটল। '৮৫ সালের জানুয়ারি মাসে হঠাৎ এক কাণ্ড ঘটল। নববর্ষের ঠিক চারদিন পরে আমরা আমাদের অভ্যেসমতো সকালবেলায় খাবার টেবিলে বসে কাগজ পড়তে পড়তে গল্প করছিলুম, এমন সময় বাবা চেঁচিয়ে উঠলেন। আমি দেখলুম তাঁর এক হাতে ধরা রয়েছে সদ্য খোলা একটা খাম আর অন্য হাতে কমলালেবুর শুকনো পাঁচটা বীজ। এত দিন পর্যন্ত বাবা কাকার ওই কমলালেবুর বীজের ব্যাপারটা আস্ত গাঁজাখুরি বলে উড়িয়ে দিতেন। কিন্তু আমার মনে হল যে ঠিক এই মুহূর্তে তিনি নিজেই বেশ ঘাবড়ে গেছেন, ভয় পেয়েছেন।

"'এ সবের মানে কী জন?' বাবা থেমে থেমে আমাকে বললেন।

"ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। আমি কোনোমতে ঢোঁক গিলে উত্তর দিলুম, 'এটা K K K।'

"বাবা খামটার ভেতরটা দেখে বললেন, 'হ্যাঁ, তাই তো দেখছি।... এই তো লেখা রয়েছে K K K। কিন্তু এটা আবার কী লেখা রয়েছে।' বাবার ঘাড়ের পাশ দিয়ে উঁকি মেরে দেখলুম খামটার ভেতরে লেখা রয়েছে, 'সমস্ত কাগজপত্র সূর্যঘড়ির ওপরে রেখে দেবে।'

"'কোন্ কাগজপত্র? আর সূর্যঘড়িই বা কী?' অবাক হয়ে বাবা আমাকে প্রশ্ন করলেন।

"'বাগানে যে সূর্যঘড়িটা আছে তার কথাই লিখেছে। আর তো কোনো সূর্যঘড়ি এ চত্বরে নেই। আর কাগজপত্র মানে যে সব কাগজপত্র কাকা পুড়িয়ে দিয়েছেন।'

"'ফুঃ ফুঃ, যত্তো সব ইয়ার্কি।' বাবা গলায় বেশ খানিকটা জোর এনে বললেন, 'আমরা একটা সভ্য দেশে বাস করি। এ

দেশে আইন-কানুন আছে। এখানে এ ধরনের বাঁদরামি চলবে না।... দ্যাখো তো চিঠিটা কোথা থেকে এসেছে।'

"পোস্ট-অফিসের ছাপ পরীক্ষা করে আমি বললুম, 'ডান্‌ডি থেকে।'

"বাবা বললেন, 'এ আর কিছুই নয়, কেউ আমাদের সঙ্গে হয় তামাশা করছে না হয় তো বজ্জাতি করছে। আমি ওই কাগজপত্র বা সূর্যঘড়িফড়ির কোনো কিছুই জানি না। আর ওই সমস্ত গাঁজাখুরি ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবারও সময় আমার নেই।'

"'আমার কিন্তু মনে হয় পুলিশে একটা খবর দিয়ে রাখা ভাল।'

"'হ্যাঁ, আর পুলিশ আমাকে পাগল ভাবুক। উঁহু, ও সব আমি কোনো কিছুই করব না।'

"'বেশ তো, আপনি নিজে যদি পুলিশকে জানাতে না চান তো আমি পুলিশকে খবর দিয়ে দিচ্ছি।'

"'না, আমি তোমাকে বারণ করছি। এই ধরনের একটা অর্থহীন বাজে ব্যাপার নিয়ে কোনোরকম হৈ-চৈ করা আমি একদম পছন্দ করি না।'

"আমি বুঝলুম যে, এ-ব্যাপারে কথা বাড়িয়ে আর কোনো ফল হবে না। আমার বাবা ভীষণ একরোখা প্রকৃতির লোক। যেটা তিনি একবার 'না' বলবেন সেটা আর 'হ্যাঁ' হবে না। তাই ইচ্ছে থাকলেও এ-ঘটনার কথা আমি পুলিশকে জানাতে পারলুম না। কিন্তু আমার মন ভয়ানক উদ্বিগ্ন হয়ে রইল।

"ওই চিঠি আসবার দিন-তিনেক বাদে একদিন আমার বাবা তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে পোর্টসডাউন হিলে গেলেন। বাবার বন্ধুর নাম মেজর ফ্রিবডি। তিনি ওই অঞ্চলের একটি দুর্গের অধিনায়ক। বাবা পোর্টসডাউন হিলে যাওয়াতে আমি মনে মনে বেশ স্বস্তি পেলুম। কী জানি কেন আমার মনে বিশ্বাস হয়েছিল যে, বিপদ আমাদের হর্শ্যামের বাড়ির আনাচে-কানাচে লুকিয়ে আছে। তাই আমি ভাবলুম যে, বাবা যদি হর্শ্যামে না থেকে অন্য কোথাও গিয়ে কিছুদিন থাকেন তো বিপদের থাবা সেখান অবধি পৌঁছতে পারবে না। তখন কি বুঝতে পেরেছিলুম যে আমার ধারণা কত ভুল। বাবা পোর্টসডাউন হিলে যাবার পরের পরের দিন আমি মেজরের কাছ থেকে একটা জরুরি টেলিগ্রাম পেলুম। তিনি আমাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পোর্টসডাউন হিলে যেতে লিখেছেন। আমার বাবা একটা গভীর গর্তে পড়ে গিয়ে মাথার খুলিতে ভীষণ আঘাত পেয়ে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় রয়েছেন। খবর পেয়েই তো আমি রওনা হলুম। বাবার জ্ঞান আর ফিরল না। বাবা মারা গেলেন। খোঁজখবর করে যা জানতে পারলুম তা হল যে, সন্ধের অন্ধকারে ফেয়ারহ্যাম থেকে একা-একা ফেরবার সময়ে তিনি খড়িমাটির গভীর গর্তে পড়ে যান। একে তো ওই অঞ্চলের পথঘাট তাঁর অচেনা তার ওপর ওই গর্তটা বেড়া দিয়ে ঘেরা না থাকায়, বিচারকদের সিদ্ধান্ত হল যে, দুর্ঘটনায় বাবার মৃত্যু হয়েছে।

"আমার বাবার মৃত্যু আমাকে ভীষণভাবে বিচলিত করল। আমার মনে হল যে, বাবার মৃত্যুটা ঠিক স্বাভাবিক নয়। কিন্তু মুশকিল হল এই যে, বাবাকে যে খুন করা হয়েছে তার কোনো প্রমাণ যোগাড় করতে পারলুম না। বাবাকে কেউ বা কারা জোর করে গর্তের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে তার কোনো সাক্ষী বা প্রমাণ পেলুম না। বাবা যে গর্তটায় পড়ে গিয়েছিলেন সেই গর্তটার কাছে বাবার ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তির পায়ের ছাপও নেই। বাবার পকেট থেকে কিছু চুরি যায়নি। এমন-কী ওই অঞ্চলে কোনো অপরিচিত লোককেও সেই সময়ে দেখা যায়নি। এ-সব সত্ত্বেও আমি মনে-মনে শান্তি পাচ্ছিলুম না। যদিও কোনো প্রমাণ আমার হাতে ছিল না তবু আমার মনের মধ্যে যে সন্দেহটা দানা বাঁধতে শুরু করেছিল সেটা একটা স্পষ্ট আকার নিল। আমার বিশ্বাস হল যে, এ-সবের পিছনে রয়েছে কোনো দুশমনের হাত।" (ক্রমশ)

অনুবাদ : সুভদ্রকুমার সেন

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

ব্যাটে-বলে

পঙ্কজ রায়

কনস্টানটাইনের প্রতিভার বিশালতার অনেক অনেক প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে ক্রিকেটের মাঠে-মাঠে। একা লড়াই করে কতবার যে তিনি তাঁর দলকে জিতিয়ে দিয়েছেন, তার কোনো সীমা নেই। কনস্টানটাইন মানে এক দুর্দান্ত লড়াই। কনস্টানটাইন মানে এক ঘোর অনিশ্চয়তা। বিপক্ষ সুনিশ্চিতভাবে জানত, এই একটি লোক কবজির জোরে খেলার মোড় যে-কোনো সময়ে ঘুরিয়ে দিতে পারেন।

১৯২৮ সাল। টেস্ট ক্রিকেটে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অভিষেকের বছর। ইংল্যাণ্ডের কাছে মার খেয়ে ধুলপাট হয়ে যাচ্ছে ক্যারিবিয়ানরা। পার্সি চ্যাপমানের নেতৃত্বে তিনটি টেস্টে ইনিংসে জিতল ইংল্যাণ্ড। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সব চাইতে বড় ভরসা কনস্টানটাইনের সময়টাও খারাপ যাচ্ছিল তখন। সকলের বিশ্বাস ছিল, একবার কনস্টানটাইন ফুঁসে উঠতে পারলে ম্যাচ জেতা কষ্টকর হয়ে উঠবে ইংল্যাণ্ডের পক্ষে। কিন্তু টেস্টে লিয়ারি কখনও লিয়ারি হয়ে উঠতে পারলেন না।

ঘটনা ঘটল মিডলসেক্সের সঙ্গে খেলায়। লর্ডসে। পায়ের একটা মাংসপেশী ছিঁড়ে গেছে লিয়ারির। ডাক্তার বলেছেন, না, খেলাধুলো এখন থাক। অন্তত এই ম্যাচটা। সম্পূর্ণ বিশ্রাম দরকার। সুতরাং লিয়ারি আরও বিমর্ষ। এই সময়ে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল অস্ট্রেলিয়ার সুবিখ্যাত ক্রিকেটার চার্লি ম্যাকার্টনির সঙ্গে। ম্যাকার্টনিকে অসীম শ্রদ্ধা করেন লিয়ারি। প্রথমে কিছু সৌজন্যমূলক কথাবার্তার পর অবশ্যম্ভাবীভাবে এসে পড়ল ক্রিকেটের কথা। অল্প সময়ের জন্য ইংল্যাণ্ডে এসেছেন ম্যাকার্টনি। ব্যক্তিগত কাজে। লণ্ডনে রয়েছেন। এদিকে মিডলসেক্স বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলা হচ্ছে লর্ডসে। খেলা দেখতে মাঠে চলে এসেছেন ম্যাকার্টনি। কনস্টানটাইনের প্রতিভা সম্পর্কে ম্যাকার্টনি অবগত ছিলেন। ইংল্যাণ্ডে এসে লিয়ারি তেমন কিছু করতে পারছেন না বলে যথেষ্ট দুঃখপ্রকাশ করলেন চার্লি। তারপর অভিজ্ঞ ক্রিকেটারের কাছে তরুণ লিয়ারি যখন উপদেশ চাইলেন, ম্যাকার্টানি বললেন, "এমন হয়। এতে ঘাবড়ে যাওয়ার কিছু নেই। তুমি বেশি সাবধানতা অবলম্বন না করে বরং একটু ব্যাট চালিয়ে খেলো। তাহলেই দেখবে, অসুবিধে কাটিয়ে উঠতে পারবে। বেদম ঠ্যাঙাবার চেষ্টা করো বোলারদের।"

লিয়ারি চুপ করে আছেন। তা দেখে ম্যাকার্টনি ভাবলেন, বোধহয় সংকোচ বোধ করছেন কনস্টানটাইন। একে বেচারির ব্যাটে রান নেই, তায় এই মারের উপদেশ নির্ঘাত ওর মনঃপূত হচ্ছে না। বললেন, "কনি, ভাবনা কোরো না। রান পাবার জন্য অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে গিয়ে তুমি তোমার স্বাভাবিক খেলা থেকে সরে গেছ। তাই এই বিপত্তি।" উপদেশ মাথা পেতে নিলেন লিয়ারি। ঠিক করলেন, আজ এই নীতিতেই খেলবেন। তাতে যা হয় হোক।

মিডলসেক্সের বড় মাপের রানের জবাবে ব্যাট করতে নেমে প্রথমেই ধাক্কা খেল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ। মাত্র ৭৯ রানের মধ্যে প্রথম পাঁচজন ব্যাটসম্যান কুপোকাত। অর্থাৎ, দরদর করে ঘামছে ক্যারিবিয়ানরা। পায়ের ব্যথায় কাতর কনস্টানটাইন ব্যাট বগলে মাঠে নেমে গেলেন। আজ এস্‌পার, নয় ওস্‌পার। কয়েক ওভার চোখে-বলে করে নেওয়ার পর ব্যাট ঘোরাতে লাগলেন কনস্টানটাইন। ভীষণভাবে কুড়ি মিনিটে পঞ্চাশ রান করলেন। এবং এক ঘণ্টারও কিছু কম সময়ে ছিয়াশি রান। কনস্টানটাইনের কল্যাণে দলের রান গিয়ে দাঁড়াল দুশো তিরিশের কোঠায়।

মিডলসেক্স, দ্বিতীয় ইনিংসে একেবারে গাড়িচাপা পড়ল। লিয়ারি ছয় উইকেট নিলেন এগারো রানে। সেদিন ভয়ংকর হয়ে উঠেছিলেন কনস্টানটাইন। নিজেই লিখেছেন, "জীবনের সব চাইতে সেরা গতির বোলিং বোধহয় সে-খেলাতেই করেছিলাম।" অবাক হয়ে গিয়েছিলেন জর্জ চ্যানেলর। ওঁর তো পায়ে ব্যথা। "কী করে এমন খেললেন, তা ঈশ্বর জানেন।" মিডলসেক্সের ইনিংস শেষে কনস্টানটাইন যখন প্যাভিলিয়নে ফিরলেন, সদস্যরা উঠে দাঁড়িয়ে অভিনন্দন জানালেন তাঁকে। বীরের যোগ্য সম্বর্ধনা।

দ্বিতীয় ইনিংসে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ গোড়াতে সুবিধে করতে পারল না। একশোর চেয়ে সামান্য বেশি রানে পাঁচ উইকেট পড়ে গেল রক্ষণাত্মক পদ্ধতিতে খেলতে গিয়ে। ব্যাট করতে যাওয়ার মুখে লিয়ারির সঙ্গে দেখা হল ম্যাকার্টনির। পিঠ চাপড়ে ম্যাকার্টনি বললেন, "যা বলেছি মনে রেখো। তাহলেই হবে।" ঘাড় নেড়ে ব্যাট করতে গেলেন কনস্টানটাইন। এক ঘণ্টার মধ্যে পূর্ণ হল শতরান। তাঁবুতে ফেরার সময় দ্বিতীয়বার উঠে দাঁড়ালেন সদস্যরা। কনির চোখ তখন একজনকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কোথায় ম্যাকার্টনি ? একটু দূরেই দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। অল্প অল্প হাসছেন আর হাতে তালি দিচ্ছেন ধীরে-ধীরে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজই সেদিন জিতেছিল।

লিয়ারি আরও একজন অস্ট্রেলিয়ানের কাছে কৃতজ্ঞ ছিলেন। সেই ক্রিকেটারটির নাম ক্ল্যারি গ্রিমেট।

গ্রিমেটের কাছে কনস্টানটাইন যখন বোলিংয়ের 'টিপস্' চাইলেন, তখন ছোট করে হাসলেন বর্ষীয়ান বোলার। বললেন, "লেংথ। মাপা লেংথ। নিখুঁত লেংথ তৈরি করাই প্রথম এবং প্রধান কাজ হওয়া উচিত একজন বোলারের ক্ষেত্রে। তা সে প্রচণ্ড গতির বোলার, মিডিয়াম পেসার, ধীর গতির, যে-ধরনের বোলারই সে হোক না কেন। ওটাই তো একজন বোলারের সর্বপ্রধান অস্ত্র।"

১৯৩৯ সালে লিয়ারি যখন বোলিংয়ে ধাঁচ বদলে ফেলে মিডিয়াম পেস বল করতে শুরু করলেন, তখনও তিনি সমপরিমাণে কার্যকর। কারণ, কাঁটার মতো নিখুঁত লেংথ।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

ভেলভেলেটা

কার্তিক ঘোষ

থাকে থাকে, মায়ের জন্যে মন কেমন করে সুকুর। খেলা করতে ভাল লাগে না একা-একা। কখনও দরমার দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ায়। কখনও জানলার ছেঁড়া থলিটা সরিয়ে চেয়ে থাকে বাইরে। ইশ! কী অন্ধকার গলি। নাকে এসে লাগে একটা বিশ্রী গন্ধ। যত রাজ্যের নোংরা-ঝোংরা সব যেন এসে জমা হয়েছে ওদের জানলার সামনে।

পাশের ঘরে গনশার ঠাক্‌মা চোখে দেখতে পায় না বলে নিজের মনেই বসে বসে বকছে। সাতসকালে উঠে ওর মা গেছে রুমকিদের বাড়ি কাজ করতে।

তাই মাকে ছেড়ে বাড়িতে একলা থাকতে ইচ্ছে করে না সুকুর। মায়ের সঙ্গে যাবে কী, রুমকির বাবা একদম পছন্দ করে না সুকুকে। একটা মাত্র ছেঁড়া প্যাণ্টুল, সেটাও কিনা মা একদিন সেলাই করে দিয়েছে পকেটসুদ্ধ। জামা না থাক, ছোট্ট একটি গেঞ্জি আছে সুকুর। কলতলায় একটা আধ-খাওয়া সাবান কুড়িয়ে পেয়ে মা সেদিন কেচেও দিয়েছে ভাল করে। কিন্তু তবু সেটা পরে রুমকিদের বাড়ি যেতে পারে না সহজে।

রুমকির বাবা যেন কেমন! কিচ্ছুতে পছন্দ করে না সুকুকে! দেখলেই দারুণ চটে যায় ওর মায়ের ওপর। "অত বড় ছেলে হয়েছে, আদর দিয়ে বাঁদর গড়ছ কেন সুকুর মা?"

রুমকি তখন ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে সুকুর দিকে।

ওর বাবা থামতে চায় না সহজে। শাসনের সুরে বলে, "মায়ের পায়ে-পায়ে ঘুরিস কেন রে? ইস্কুল যেতে পারিস না?"

রুমকির মা আবার এককাঠি সরেস। সুকুকে হাবা বলেই ভাবে। ও নাকি কথা বলতেই জানে না, পড়বে কী! তাই ফুট কাটে যখন-তখন। "আর একটু বড় হলেই বরং ওকে কোনো চায়ের দোকানে দিয়ে দিও সুকুর মা। আখেরে কাজে লাগবে।"

চায়ের দোকানের নাম শুনলেই বুকটা ধড়াস করে ওঠে সুকুর। লুকিয়ে লুকিয়ে দেখেছে মায়ের চোখদুটোও যেন কেমন ভিজে-ভিজে হয়ে আসে তখন।

পাশের ঘরের গনশা চায়ের দোকানেই কাজ করে গলির মোড়ে। সুকুর চেয়ে মাথায় একটু বড়। কিন্তু কাজে কোনো ভুল করলেই রামথাপ্পড় জোটে কপালে। একদিন আবার একসঙ্গে দু-দুটো কাপ ভেঙেছে বলে কী মারই না খেতে হল গনশাকে। আড়াল থেকে সব দেখেছে সুকু। মাকেও বলেনি।

ভাঙা টিনের রথটা মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে মেঝেতে। রবারের ছোট্ট বলটা নিয়ে বাইরে বেরুবে কী, ভেংচি কাটবে কোঠাবাড়ির ছেলেরা। কেউ ভয় দেখাবে চোখের পাতা উলটে। কেউ বলবে, এই ছেলেটা, ভেলভেলেটা, আমাদের পাড়া যাবি?

সুকু কিচ্ছু বলতে পারে না। সবার কাছেই সে হেরে যায়। গলির মুখে দাঁড়িয়ে থাকে চুপটি করে।

মা তার কখন আসবে কে জানে! এখনও বোধহয় কলতলায় পড়ে আছে এককাঁড়ি বাসন। মা হয়তো এখন সাবান মাখিয়ে দিচ্ছে রুমকিকে।

ইশ্! রুমকির গায়েমাখা সাবানটার কী গন্ধ! মাখলে ফুলের বাস ছাড়ে সারা বাড়িতে। সুকু বড় হলে মাকেও কিনে দেবে ওইরকম সাবান।

কিন্তু বেলা বাড়লে কে জানে মায়ের জন্যে এমন মন-কেমন করে কেন! বড্ড খিদে পায়। সকাল থেকে কিচ্ছু না খেলে রবারের নতুন বলটা নিয়ে একলা ঘরে খেলা করতে ভাল লাগে কারও! মা-টা যেন কী! সব সময় শুধু রুমকি আর রুমকি! অত বড় মেয়ে নাকি চুল আঁচড়াতেও পারে না নিজে-নিজে। বায়না ধরে রোজ-রোজ কেন বাড়ি ফিরতে দেরি করিয়ে দেয় মাকে। সুকুর মাথায় ঢোকে না এসব। উলটে মায়ের ওপর অভিমান করে ডবডবিয়ে আসে চোখদুটো। রবারের বলটা চুষতে-চুষতে কখন এসে শুয়ে পড়ে মেঝেতে। তারপর আর কিছু মনে থাকে না।

মাঝে-মাঝেই মা এসে ঘুম ভাঙায়। আঁচল খুলে বার করে বাসী রুটি। সঙ্গে একটু গুড় থাকলে আর কে পায় সুকুকে। কিন্তু খাবার কি কিছু জো আছে এই বস্তিতে!

লালটুর বাবা, ক'মাস হল যার কাসির রোগ বেড়েছে বলে বাড়ির লোকেরা বার করে দিয়েছে উঠোনে, সে লোকটাও এসে হাত পাতে মায়ের সামনে। বলে, ভিক্ষে দে মা, একখানা রুটি ভিক্ষে দে বুড়ো বাপটাকে। সুকুর অবশ্য রাগ হয় না সে জন্যে। বরং মন-কেমন করে।

গনশার ঠাক্‌মা বেরুতে পারে না বাইরে। সুকুর মায়ের পায়ের একটু শব্দ পেলেই কাকুতি-মিনতি করে আধখানা রুটির জন্যে। "বলি, ও সুকুর মা—কাল রেত থেকে যে কিচ্ছু খাইনি গো! আধখানা রুটি দিবিনি?"

সুকু মায়ের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকে। মা কেন একটুও রাগ করে না কোনোদিন! কেন রোজ রাত্তিরে শুধু বলে, না রে খোকা, সত্যি আজ আমার খিদে নেই!

বাবাকে মনে পড়ে না সুকুর। মায়ের মুখে শুনেছে দারুণ হাসিখুশি মানুষ ছিল ওর বাবা। চাকরি করত আপিসে। মাইনের দিন নতুন টাকার গন্ধ ছাড়ত গোটা ঘরে। তখন নাকি মাথার ওপর পাখা ঘুরত মায়ের। তারপর আচমকা একদিন ফুরিয়ে গেল সেই সুখ। কোথায় যেন হারিয়ে গেল ওর বাবা। লালটুর এক দাদাও নাকি হারিয়ে গিয়েছিল একবার। কিন্তু কাঁধে রেডিও ঝুলিয়ে ফিরে এসেছিল ক'মাস বাদেই। সুকুও রোজ ওইরকম ভাবে। কিন্তু মাকে জিজ্ঞেস করলেই সেই এক কথা। আকাশের ওপারে নাকি সগ্‌গো। সেখানে যে যায়, সে আর ফিরে আসতে চায় না এই মাটিতে। অথচ কী আশ্চর্য, এসব শুনেও বারবার বাইরে ছুটে যেতে ইচ্ছে করে বাবার জন্যে। মাঝে-মাঝেই মনে হয়, বড় রাস্তার পাশেই যে আকাশছোঁয়া বড় বাড়িটা আছে—মাকে লুকিয়ে একদিন তার চিলের ছাদে উঠবে। সেখান থেকে শুধু একবার খুব জোরে গলা ফাটিয়ে সুকু ডাকবে—ও বাবা—বাবা গো—

কিন্তু কী করে কী হবে কিচ্ছু ঠিক করতে পারে না একলা। বই-শেলেট পড়ে থাকে একপাশে। দুপুরে কোনো-কোনো দিন মা ওকে পড়াশুনো শেখায়। তবু থেকে-থেকেই মনটা উশখুশ করে কেন, কে জানে!

বাবার নাকি অনেক টাকা পাওনা আছে আপিসে! কত টাকা, সে হিসেব সুকু জানে না। মায়ের মুখে শুনেছে, সে-সব টাকা পেলেই এই বস্তিবাড়িটা বদলে ফেলবে ওরা। তারপরই একটা ইস্কুলে ভর্তি হবে সুকু। রুমকিদের বাড়িতে মাকে কাজ করতে যেতে হবে না আর। একটা চৌকি কিনবে ওর মা। কিনবে মাথার বালিশ। লাল শালুর লেপ। শীতের রাতে আর চট গায়ে দিয়ে কাঁপতে হবে না হি-হি করে।

কিন্তু কবে হবে সে-সব। কত দেরি আছে আর। কিছুতেই যেন তর সয় না সুকুর। টুপসির বাবা, ওই যে কুয়োতলার সামনের ঘরটায় যে লোকটা থাকে, ঘুগনি বিক্রি করে মোড়ের মাথায়—সেই লোকটাই তো কতদিন হল লিখে দিয়েছে একটা দরখাস্ত।

বাস রে! কী ঝামেলা সেই নিয়ে। টুপসির মা জোর করে একদিন ওদের ফুটো বালতিটাই টেনে নিয়ে গেল ঘর থেকে। শুধু হাতে নাকি কোনো দরখাস্তই লেখা হয় না আজকাল।

গনশার ঠাক্‌মার কাছে সুকুকে রেখে মা অনেকবারই গেছে সেই আপিসে। সেখানেই নাকি জমা আছে বাবার টাকা। সে নাকি মস্ত এক আপিস কলকাতায়। সবাই বলে লালবাড়ি। সেখানে সব সাহেবরা নাকি কাজ করেন টেবিল-চেয়ারে বসে।

কিন্তু শুকনো মুখে মা যেদিন ফিরে আসে সেদিনই সুকু শোনে, বড়সাহেব নাকি সেদিন আসেননি। ছুটিতে আছেন। আবার কোনোদিন শোনে, ছোটসাহেব এখন বাইরে। ফিরলেই সই হয়ে যাবে ফাইল।

তবু সুকুর মাথায় ঢোকে না এতসব। দরমার দেয়ালে ক্যালেণ্ডারের কালীঠাকুর কেটে মা যেখানে সেঁটে রেখেছে আঠা দিয়ে, সেখানে মাথা ঠেকিয়ে সুকু এক-একদিন মনে মনে বলে, মা গো, বড়সাহেবকে আর ছুটি দিও না মা। ছোট সাহেবকে তাড়াতাড়ি ফেরত এনে দাও।

কিন্তু ক্যালেণ্ডারের কালী বোধহয় সহজে কান দেন না কোনো ছোটছেলের কথায়। উলটে বরং ঘুগনিঅলা বুড়োটা তক্কে-তক্কে থাকে সব সময়। মাকে কোথাও যেতে দেখলেই বলে, কিছু হল? সই-সাবুদ কদ্দূর? বেরুলে মিষ্টি চাই না, গোটা-দশেক নগদ দিলেই হবে।

গনশার ঠাকমা শুধু গরম জিলিপি খেতে চেয়েছে একদিন। লালটুর বাবার সমুদ্রের কাঁকড়া খাবার খুব শখ। আহ্ রে! সে আর ক'টাকাই বা খরচা। সুকু দেখেছে, কাসতে কাসতে কুঁকড়ে যাওয়া ঐ বুড়োটার জন্যেও মাঝে-মাঝে চোখ দুটো চিক-চিক করে ওঠে মায়ের।

ও নিজেও ভেবে রেখেছে, বাবার টাকা বেরুলে মাকে বলে একটা টাকা চেয়ে নেবে একদিন। তারপর আইসক্রিম কিনে লালটু, টুপসি আর গনশাকে খাওয়াবে। পয়সা বাঁচলে, পিপির-পিপ টিনের বাঁশি কিনবে একটা। টুপসিকে বরং কিনে দেবে একটা বেলুন। বাঁদর-খেলা দেখতে গেলে বাদাম ছুঁড়ে

দেবে একমুঠো। সে দারুণ মজা হবে!

একদিন তাই মায়ের সঙ্গে সঙ্গে যাবার বায়না ধরল সুকু। বাসে যাবার পয়সা নেই তো কী হয়েছে, হেঁটেই যাবে দিব্যি। না না, পা কনকন করবে কেন! সুকু কি সেই ছোট্টটি আছে এখনও? ধুস! রোজ যে এখন একটু-একটু করে বড় হচ্ছে সুকু। টুপসিই কালকে বলেছে, গনশার সমান হতে আর নাকি একটুখানি মাত্র বাকি!

অভিমানে কাঁদো-কাঁদো হতেই মা রাজি হয়ে গেল। বড় রাস্তা ধরে বেরিয়ে পড়ল মায়ের সঙ্গে। সামনে শুধু আকাশছোঁয়া বাড়ি আর ঝকঝকে গাড়ির মিছিল!

ইশ! এই বুঝি সত্যিকার কলকাতা! চমকে উঠল সুকু। পিছন থেকে ভেংচি কেটে কারা যেন বলছে, এই ছেলেটা ভেলভেলেটা—কলকাতাতে যাবি?

কিন্তু না! কেউ ওকে দেখছে না! মা হঠাৎ একটা হাত ধরে টান দেয় সুকুর।

এই তো সেই লালবাড়ি। বাপ রে! কী মস্ত চেহারা! কত্তো লোক ঢুকছে আর বেরুচ্ছে এই দুপুরবেলা। পাহারাদার মানুষটা কী ভাল! মায়ের সঙ্গে গেঞ্জি-পরা সুকুকে দেখেও কিছু বলল না।

দিব্যি সে মায়ের সঙ্গে ঢুকে পড়ল একটা ঘরে!

সামনেই এক টেবিলে রুমকির বাবার মতন একটা লোক পাউরুটি, ডিমসেদ্ধ আর কলা খাচ্ছিলেন কৌটো খুলে। মায়ের দিকে চোখ পড়তেই বললেন, "হ্যাঁ, ফাইল সেই বড়সাহেবের টেবিলেই আছে, এখনও আসেনি।"

ফিসফিস করে মায়ের মুখেই সুকু শুনে গেল, "এই হচ্ছে ছোটসাহেব। আর ঐ যে—ঐ ওদিকে—উনি হচ্ছেন—।"

মাকে আর বলতে হল না। সুকু যেন কেমন করে বুঝে গেল, সামনের বড় টেবিলটায় হাসি-হাসি মুখ করে যিনি ফোন ধরে বসে আছেন, তিনি বড়সাহেব।

কিন্তু আশ্চর্য, কী আশ্চর্য! সাহেবরা যে সব এইরকম দেখতে হয় সুকু এর আগে কল্পনাও করেনি কখনও! সবাইকেই যেন মনে হয় মোড়ের মাথায় দেখেছে! কিন্তু সব্বাই কেন রুমকির বাবার মতন রাগী? কেন ওদের সঙ্গে কেউ ভাল করে কথা বলতে চান না? কিচ্ছু বুঝতে পারে না সুকু!

বড়সাহেবও হঠাৎ খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন মাকে দেখে। টেলিফোন মুখেই বললেন, "রোজ-রোজ আসার দরকার নেই। ফাইল ওপরে গেছে! আগে নামুক। তারপর দেখব।"

ফিরে আসার পথে ফাইল কথাটা ঘুরপাক খেতে লাগল সুকুর মাথায়। মা-ও কিছু বুঝিয়ে বলতে পারল না ওকে।

এমনি করেই কয়েক মাস গেল। আবার একদিন সেই লালবাড়িতেই যেতে হল মায়ের সঙ্গে। সেদিন আবার চেয়ারেও দেখা গেল না বড়সাহেবকে। শুধু তাঁর কালো একটা কোট ঝুলছে চোখে পড়ল।

ছোটসাহেব তাঁর টেবিলে তাস খেলছিলেন দলবল নিয়ে। সুকু আর ওর মাকে দেখেই খেঁকিয়ে উঠলেন তিনি, "আবার আজকে? সেদিনই তো বললুম, বড়সাহেবের টেবিলে আটকে আছে ফাইল। না এলে কিছু হবে না!"

মা আর দাঁড়ায়নি। বলা যায় না, বড়সাহেব দেখে ফেললে যদি আরও রেগে যায়। সুকুর কিন্তু সব রাগ গিয়ে পড়ে বাবার

everest/84/INL/137-bn.

ওপর। বাবাটা কেন এমন বোকা কে জানে। নিজের টাকা এমনি করে কি রাগী সাহেবদের কাছে কেউ রেখে যায়! মা বুঝি বেঁধে রাখতে পারত না পুঁটলিতে? হায় রে! বাবার কথা ভাবতে গিয়ে চোখ দুটো আবার ঝাপসা হয়ে আসে ছেলেটার!

তবু, সেদিন সকাল থেকে উশখুশ করে সুকুর মনটা। মা কাজে বেরিয়ে যেতেই উঠোনে বেরিয়ে আসে সুকু। অনেক দূরের একটা হলুদ বাড়ির মাথায় উঁকি দেয় একটুখানি আকাশ। কে জানে, নীল চোখে কার জন্যে অমন নীল ইশারা তার! কেউ বোধহয় দেখতেও পায়নি বস্তিবাড়ির ছেলেটা হঠাৎ কোথায় ছুটছে পাঁই পাঁই করে!

সেই বড় রাস্তা, গাড়ির মিছিল, সব পেরিয়ে ছুটছে একটা ছেলে!

কে বলেছে চিনতে পারবে না। কে বলেছে হারিয়ে যাবে সুকু। ইশ! তাই কখনও হয়! ওই তো সেই লালবাড়ি। মস্ত সেই লোহার রেলিং-ঘেরা ফটক!

সুকুর মুখে হাসি ফোটে হঠাৎ। কিন্তু বন্ধ কেন ভেতরে যাবার রাস্তা? পাহারাদার কোথায়? পাহারাদার? কেউ যেন সাড়া দেয় না সুকুকে। নাই দিক, রেলিং গলে ছোট্ট সুকু পৌঁছে যায় সাহেবদের সেই ঘরে।

কিন্তু কই, কোথাও কেউ নেই কেন? খাঁ-খাঁ করছে গোটা আপিস। ভারী অবাক হয়ে যায় সুকু। পিছন ফিরে দেখতে যাবে, কারা যেন হেসে ওঠে খিলখিল করে। সুকু অমনি চমকে ওঠে ভয়ে!

"ইশ! আজ কী মজা আমাদের! ছুটির দিন কি না—।" সামনের টেবিল থেকে কে যেন বলে ফেলল কথাটা। সুকু এবার অবাক হয়ে যায় আরও। কী যেন নড়ে উঠল ওটা? ওমা! ও যে একটা বেগনি কাগজের মলাট। লাল ফিতেয় বাঁধা।

আশপাশের টেবিলে আরও অনেক। কেউ হলুদ, কেউ সবুজ, কেউ গোলাপি মলাটের মতো দেখতে। সবাই যেন হঠাৎ একসঙ্গে বলে ওঠে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমাদেরই সাহেবি নাম ফাইল।

বড় টেবিল থেকে অমনি টিপ্পনী কাটল নীলমুখো আর একটা। সে বলল, "তোমরা যাই বলো, আমার কিন্তু বাংলা নামটাই বেশ পছন্দ।" তারপর সুকুর দিকে চেয়ে হাসি-হাসি মুখ করে করে বলল, "তুমি আমাকে নথি বলেও ডাকতে পারো। রাগ করব না।"

অবাক হয়ে চেয়ে রইল সুকু! এই তাহলে সেই ফাইল! কী আশ্চর্য! আনন্দে চোখ দুটো যেন ঝিকমিক করে উঠল হঠাৎ। সাহস করে বলল, "আমার বাবার সেই টাকাটা যদি পেতুম—" অমনি যেন সবাই কেমন চুপসে গেল।

"হায় রে কপাল!" রোগা পটকা একটা পাঁশুটে ফাইল দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে বলল, "হ্যাঁ, সেই-ই তো ওই নীল মলাটের নথি। ওই যে বড়সাহেবের বড় টেবিলে পড়ে আছে দেখছ, ওর বুকেই বাঁধা আছে সে কাগজটা। কিন্তু—"

বলতে বলতে যেন কান্নায় বুজে এল তার গলা। তবু বলল, "সাহেবের একটা সইয়ের জন্যে পাক্কা সাত মাস পড়ে আছে বেচারি।" সুকুর হাতটা যেন নিশপিশ করে উঠল এবার। বললে, "জানো, আমাদের দরমা-ঘেরা ঘরটায় বড্ড শীত পায়। বিষ্টি পড়ে—।" গলাটা বুঝি ধরে আসে ছেলেটার। একটা সবুজ ফাইল বুঝতে পেরে বলে, "তোমার মতো আরও কত কান্নার কথা চিঠি হয়ে জমা পড়ে আছে আমাদের বুকের মধ্যে। তাই তো মাঝে-মাঝেই বড্ড ব্যথা-ব্যথা লাগে বুকটায়। হু-হু করে—।"

গোল টেবিলের গোলাপি ফাইল যেন গুমরে ওঠে এবার। "লাল ফিতের ফাঁসটা যেন কিছুতেই আলগা করে বাঁধতে চান না তোমাদের ছোটসাহেব। বলি, আমরা কি ফাঁসির আসামি?"

সুকু হকচকিয়ে যায় এসব কথায়। তবু সাহস করে দাঁড়ায় গিয়ে বড় টেবিলটার সামনে। নীল ফাইলটার গায়ে হাত রাখে আলতো করে। "বাবার টাকা বেরুলে মা বলেছে ইস্কুলে ভর্তি করে দেবে আমাকে।"

বলতে বলতে যেন গলাটা একটু ভিজে আসে সুকুর। তবু বলে, "জানো, আর ক'দিন বাদেই গনশার মাথার সমান-সমান হয়ে যাব আমি! তখন যদি আমাকে ইস্কুলে নিতে না চায়!" বলতে বলতে ফাইলের বুকের ওপর মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ওঠে সুকু।

"আহা! কাঁদছ কেন শুধু শুধু?" সবাই যেন একসঙ্গে বলে ওঠে হঠাৎ—"আমাদের কি পা আছে যে হেঁটে বেড়াব টেবিলে-টেবিলে? হাত আছে যে ফাঁস খুলে সব সই করিয়ে রাখব সঙ্গে সঙ্গে?"

"তাই তো! ঠিকই তো!" এবার যেন মনের মধ্যে ঝিলিক দিয়ে চমকে ওঠে বিদ্যুৎ! মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়ায় সুকু। সত্যিই তো, ফাইলরা কী করবে! ওদের তো আর সুকুর মতন হাত নেই যে গুলতি ছুঁড়বে। পা-ও নেই যে পাঁই-পাঁই করে ছুট দেবে কোথাও!

গোল টেবিলের গোলাপি ফাইল এবার গর্জে উঠল আচমকা। বলল, "জানো, আমাদের হাত-পা থাকলে আমরাই ছিঁড়ে ফেলতুম সব লাল ফিতের ফাঁস। কে পড়ে থাকত এই টেবিলে? তোমার সঙ্গেই আমরা ছুটতুম এক-একদিকে। শীতকালে কারুর গায়ে পৌঁছে দিতুম চাদর, ইস্কুলের মাইনে, কারুর হাতে রুটি—।"

সবুজ ফাইল যেন আনন্দে উলটে পড়তে চায় টেবিল থেকে। সে বলে, "সাহেবদের তখন চাকরি যেত সই করার। ইশ! কী এক মজার কাণ্ড হত—তাই না?"

কিন্তু কই? কার সঙ্গে এখন কথা বলছে তারা! সেই ছেলেটা, সে কোথায় গেল? কোথায়? কোনদিকে?

সারা সকাল খুঁজে খুঁজে মা-ও তাকে পেল না।

শেষকালে, বেলা গড়িয়ে যখন দুপুর হল, তখন যেন কে বলল, বস্তির পুবদিকে যে এঁদো পুকুর, সেখানেই নাকি সে যেতে দেখেছে সুকুকে।

সেখানেই ছুটল তার মা।

কিন্তু ও কী? একতাল মাটি নিয়ে আজ ওসব কী গড়ছে ছেলেটা? একটা-একটা করে শুকোতে দিচ্ছে চড়া রোদে।

কিচ্ছু বুঝতে পারে না ওর মা। অবাক হয়ে তাই দাঁড়িয়ে থাকে পিছনে। কে জানে, আজ হঠাৎ কী জন্যে অত ছোট-ছোট হাত আর পা গড়ছে ছেলেটা!

ছবি: সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

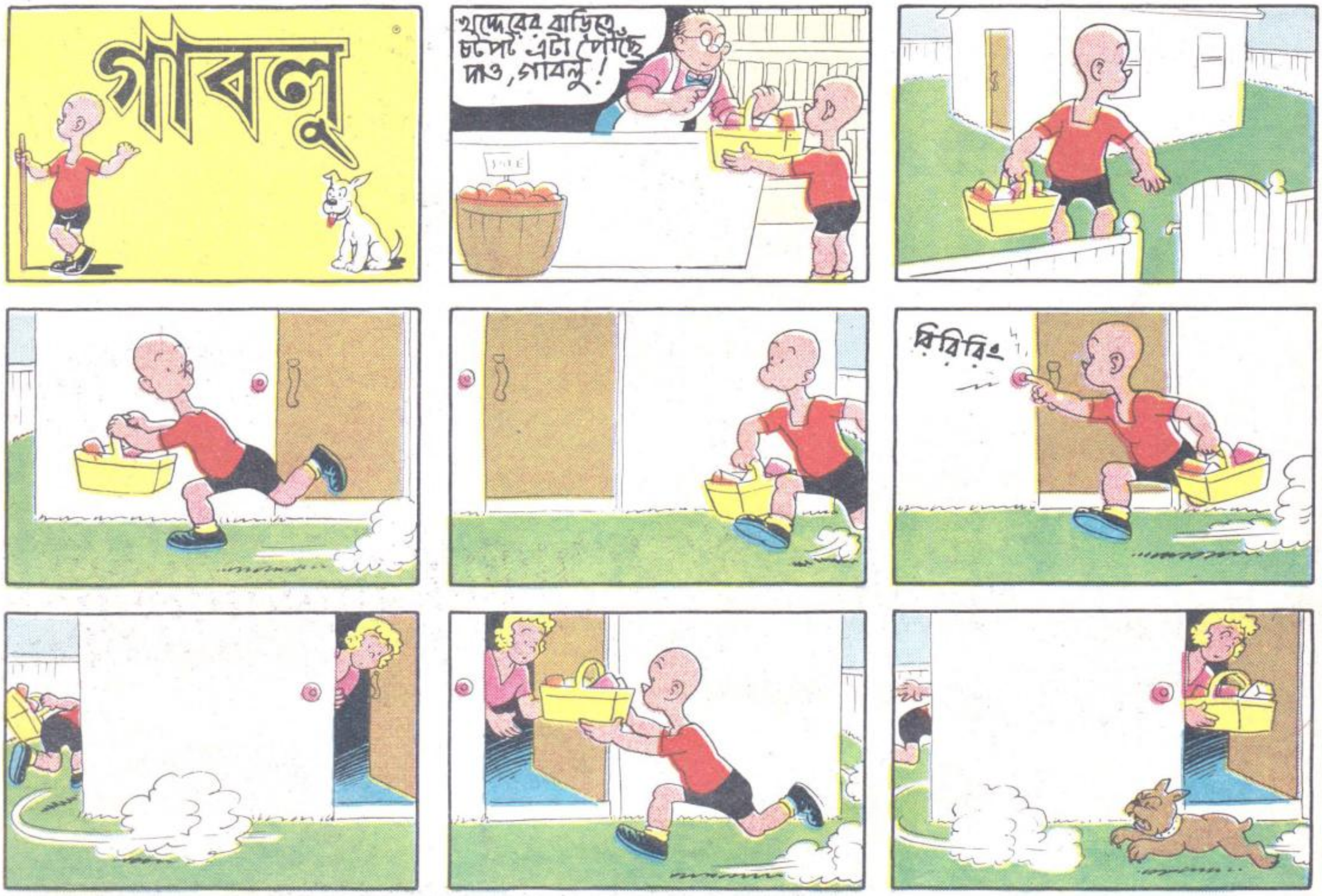
গাবলু
খুদেবের বাড়িতে চটপট এটা পৌঁছে দাও, গাবলু!
ক্রিরিরিং

গাবলু
মাছ পেলি গাবলু?
এই দ্যাখ্!
সুতো ছিঁড়ে গেছে!
মাছটা নিশ্চয় খুব বড়?
একবার দেখা তো

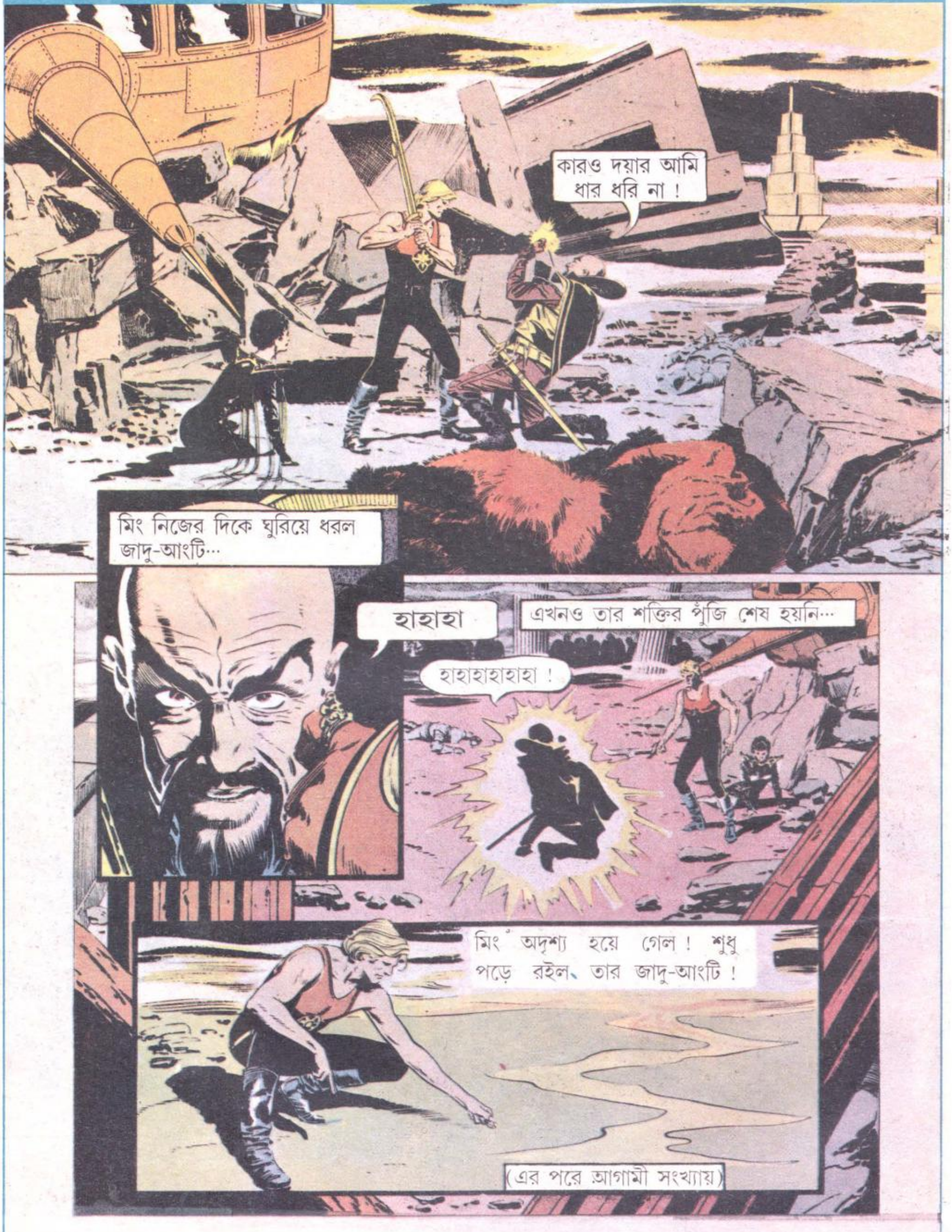
কারও দয়ার আমি ধার ধরি না !
মিং নিজের দিকে ঘুরিয়ে ধরল জাদু-আংটি···
হাহাহা
হাহাহাহাহাহা !
এখনও তার শক্তির পুঁজি শেষ হয়নি···
মিং অদৃশ্য হয়ে গেল ! শুধু পড়ে রইল তার জাদু-আংটি !
(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

পার্থসারথি চক্রবর্তীর বই মানেই মজার বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের মজা

বিজ্ঞানের রহস্যের প্রতি কিশোর-মনকে আকৃষ্ঠ করার মতো নির্ভরযোগ্য বই বাংলা ভাষায় খুব কমই প্রকাশিত হয়। পার্থসারথি চক্রবর্তী শুধু যে সেই অভাবই পূরণ করে চলেছেন তাই নয়, বিষয়কে সরস এবং মজাদার, কৌতূহলকর এবং আকর্ষণীয় করে তুলতে হয় কোন জাদুতে, তাও তাঁর অজানা নয়। গল্পচ্ছলে তিনি শেখান বিজ্ঞানের নানান গভীর তত্ত্ব ও বিজ্ঞান নিয়ে হরেক রকম খেলা, শোনান বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের গল্পকাহিনী, বুদ্ধিকে শান দেবার জন্য দারুণ-দারুণ মজা দেন উপহার। তাঁর বই বেরুতে-ই তাই আলোড়ন পড়ে যায় কিশোরমহলে।

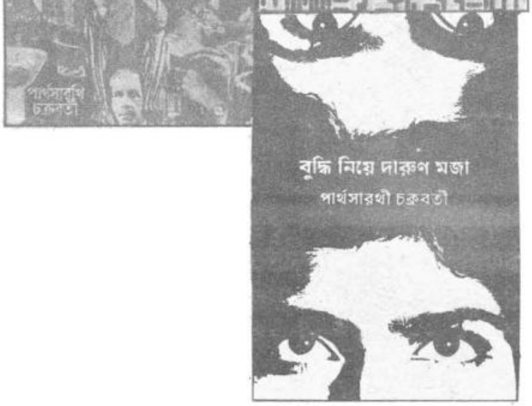

পার্থসারথি চক্রবর্তীর বই

কেমিক্যাল ম্যাজিক ৬·০০
চিকিৎসাবিজ্ঞানের আজব কথা ৬·০০
রসায়নের ভেলকি ৪·০০
ম্যাজিকের মত মজা ৬·০০
তত সহজ ছিল না ৬·০০
মজার এক্সপেরিমেন্ট ৫·০০
বুদ্ধি নিয়ে দারুণ মজা ৬·০০
পদার্থবিজ্ঞানের খোশখবর ৭·০০
ছোটদের বিজ্ঞানকোষ ৫৫·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

হাই-ওঠা ক্রিকেট

অশোক রায়

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা নিহত হন একত্রিশ অক্টোবর। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুসারে পাকিস্তানে সফররত ভারতীয় ক্রিকেট দল সফর বাতিল করে দেশে ফিরে আসেন। এখানে ফৈসলাবাদের দ্বিতীয় টেস্টের বিবরণ দেওয়া হল।

ছুটির দিনে ম্যাটিনি-শোতে সিনেমার টিকিট না পেলে কিংবা তেমন জরুরি কাজের তাড়া না থাকলে তবেই এমন পীড়াদায়ক ক্রিকেট বসে-বসে দেখতে হয়। ক্রিকেট তো নয়, যেন ঘুমপাড়ানি গান।

ইমরান অনুপস্থিত, সুতরাং ফৈসলাবাদে টেস্ট মানে ধরেই নেওয়া হয়েছিল নিস্পন্দ পিচের নীচে নিরুত্তাপ ড্রয়ের একটি কঙ্কাল শোয়ানো রয়েছে। প্রতিপক্ষ দুই দেশের অধিনায়কই এই টেস্টে টসে জেতার জন্যে আকুলভাবে অপেক্ষা করেছিলেন। কারণ, এমন নিরুদ্বিগ্ন পিচে টসে জিততে পারলেই দিন-দুয়েক নিশ্চিন্তে দিবানিদ্রা দেওয়া যায়। 'ইচ্ছামৃত্যু' বরণ না করলে ব্যাটসম্যানরা এখানে ব্যাট হাতে আজীবন রাজত্ব করতে পারেন। কিন্তু মুশকিল হয় বোলারদের। এই পিচে বল ঘোরে না, বাঁকে না, কথা কয় না। সুতরাং বোলাররা জানেন, ওভারের পর ওভার নিষ্ফল বোলিং করে যেতে হবে।

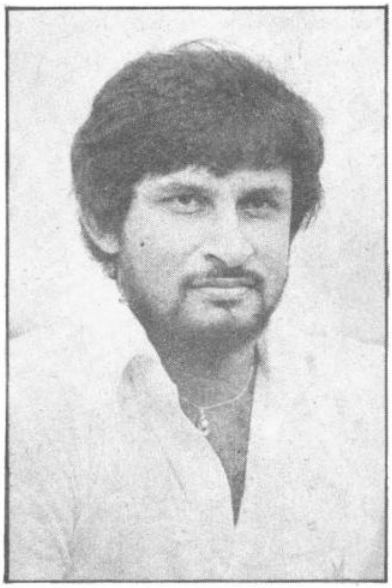

সন্দীপ পাটিল

সৌভাগ্যই বলতে হবে গাওস্কর এই টেস্টে টসে জিতেছিলেন। কিন্তু ইনিংসের শুরু থেকেই ভয়ের একটা পাথর আমাদের বুকে চেপে ছিল। কারণ, পাক আম্পায়ারদের 'আঙুল'।

কিন্তু গাওস্কর-গায়কোয়াড় জুটি যে আক্রমণাত্মক ব্যাটিং শুরু করেন, তাতে অচিরেই ভারত ফিরে আসে আস্থায়। গাওস্কর সাবলীলভাবে শুরু করে 'সেট' হয়ে যাবার পরেও ঠিক লাঞ্চের পরেই আউট হচ্ছেন কেন সেটা বোঝা ক্রমেই দুর্বোধ হয়ে পড়ছে। চমৎকার খেলেছেন গায়কোয়াড়। তাঁর ৭৪ রানের স্বচ্ছন্দ ইনিংসটি ভরসা জুগিয়েছে পরের ব্যাটসম্যান সন্দীপ পাটিল এবং রবি শাস্ত্রীকে।

গায়কোয়াড় যেখানে ছেড়েছিলেন সেখান থেকেই দায়িত্ব নেন পাটিল-শাস্ত্রী জুটি। একশো সত্তর থেকে তিনশো সত্তরে ভারত পৌঁছনোর পরেই হঠাৎ বোধহয় পাটিলের মনে হয়েছিল প্যাড পরে প্যাভেলিয়ানে রয়েছেন আরও কয়েকজন। সুতরাং মুদাস্সরকে উইকেট বিলিয়ে পাটিল ফিরে গেলেন।

কিন্তু দীর্ঘ সময় বসে থাকার ক্লান্তিতেই কিনা বলা যায় না, কপিলদেব, মদনলাল এবং কিরমানি দ্রুত আউট হওয়ায় ভারত থমকে দাঁড়াতে বাধ্য হয়। তবে শেষ উইকেটে শিবলাল যাদব এবং চেতন শর্মা শেষ পর্যন্ত ভারতকে পৌঁছে দেয় পাঁচশোয়।

পুরো দুটো দিন ড্রেসিংরুমে পিকনিক-মুডে কাটিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটাররা মাঠে নামেন। এবং আলস্য ঝেড়ে ফেলার আগেই বুঝে যান শুধু

রবি শাস্ত্রী

বোলাররাই নন, এই টেস্টের বাকি দিনগুলোয় সবাইকেই অনেকগুলো শার্ট ঘামে ভেজাতে হবে। হলও তাই। প্রথম উইকেটে যদিবা পড়ল ১৪১ রানে, দ্বিতীয় উইকেটে জুটিতে মুদাস্সর নজর এবং কাশিম ওমর রান-সংখ্যাকে টেনে নিয়ে গেলেন ৩৯১-তে। জুটিতে আড়াইশো রান ভেঙে দিল ১৯৬০-৬১ সিরিজে বোম্বাইতে হানিফ মহম্মদ-সৈয়দ আহমেদের গড়া ২৪৬ রানের রেকর্ড। কিন্তু ঘুমজড়ানো ইকবাল স্টেডিয়াম স্বপ্নভঙ্গের কারণে চিৎকার করে উঠেছিল একবারই, যখন মুদাস্সর ১৯৯ রানে আউট হয়ে গেলেন। টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে ১৯৯ রানে আউট হবার ঘটনা এই প্রথম ঘটল।

এরপরেই ক্রিকেট আবার গভীর ঘুমে ঢলে পড়ে জাহির এবং কাশিম ওমরের ঝিম-ধরা ব্যাটিংয়ে। কাশিম এই টেস্টে অবশ্য দ্বিশতাধিক রান করেছেন খুঁটে-খুঁটে। একেবারে শেষ পর্বে সেলিম মালিকের মারমুখী ব্যাট (১০২ নট আউট) দেওয়ালির কথা মনে করিয়ে দিয়েছে রানের রংমশাল জ্বেলে। পাকিস্তান যখন টেস্টে ৬৭৪ রানের সর্বোচ্চ রেকর্ড গড়ে খুশিতে ঝলমল করতে করতে ফিরছিল তখন প্যাভেলিয়ানে হাতে স্টিচ নিয়ে শাস্ত্রী, জ্বরের কষ্টে গাওস্কর আর পিঠের ব্যথায় কাতরাচ্ছিলেন কপিলদেব।

সব শিশুরই এক সুর
গেঞ্জি পরুন কোহিনুর
কোহিনুর নিটিং মিলস্
গেঞ্জি • জাঙ্গিয়া
প্রস্তুতকারক

রাষ্ট্রপতি
পুরস্কার বিজয়ী
গ্রেট
রেমন
সার্কাস
২-১২-৮৪ থেকে পার্ক সার্কাস ময়দানে
প্রত্যহ ১, ৪, এবং ৭টায়

পাহাড়-চুড়োয় সোনা জিতল মহমেডান

সম্রাট রায়

পাহাড়-চুড়োয় সোনার খোঁজ পেল মহমেডান। দার্জিলিংয়ে গোল্ড কাপ জিতল ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে। ফেডারেশন কাপজয়ী মহমেডান এবং সদ্য আই এফ এ শিল্ডবিজয়ী ইস্টবেঙ্গল বেশ কিছু নামী ফুটবলারকে এশিয়া কাপের জন্যে ছেড়ে এসেছিল কলকাতায়। কিন্তু মাঠের ভিড় প্রমাণ করেছে, ফুটবলের আকর্ষণে সম্মোহিত হবার জন্যে দুটি প্রিয় দলের ঐতিহ্যময় উপস্থিতিটুকুই যথেষ্ট। শুধু কলকাতা নয়, ফুটবল ছড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন দূরের জেলার মাঠেও। একটু গর্বের সঙ্গেই বলা যায় ফুটবলের জন্যে নিবেদিত একটি রাজ্যের নাম এখন পশ্চিমবঙ্গ।

সেন্ট জোসেফ স্কুল গ্রাউণ্ডটি সাত জন কি বড় জোর ন'জনের পক্ষে উপযুক্ত। সেই মাঠে ভারত-কাঁপানো দুটি ডাকসাইটে দল গায়ে গা লাগিয়ে ফুটবল খেলল বটে, কিন্তু পায়ের জঙ্গলের মধ্যে গোলের ঠিকানা খুঁজে পেল না কেউই। অথচ প্রথমার্ধে ইস্টবেঙ্গল যে ফুটবল খেলেছে, তাতে এই ম্যাচ অতিরিক্ত সময় পর্যন্ত গড়াবার কথাই নয়। গুরুং, কার্তিক, মিহির,

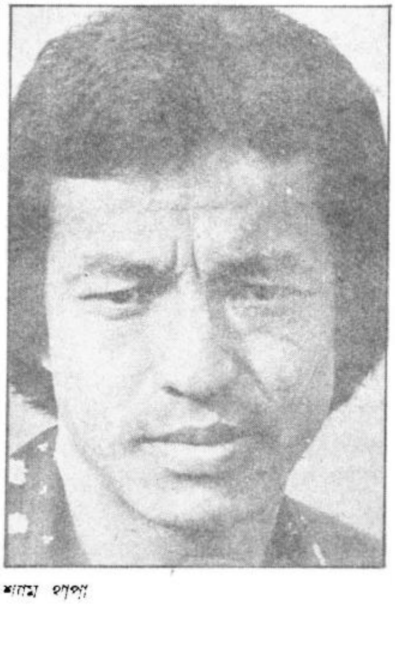

শ্যাম থাপা

দেবাশিস পেনাল্টি বক্সের মধ্যে সুযোগ নষ্টের মেলা বসিয়েছিলেন অযথা ভিড় বাড়িয়ে, শট নিতে দেরি করে, অথবা হেলায় উড়িয়ে দিয়ে। দিনের সহজতম সুযোগটি পেয়েছিলেন শ্যাম থাপা। বারের নীচে গোলরক্ষক দিলীপ পাল তখন মাত্র ছ'গজ দূরে শ্যামের দয়ায়। বহু যুদ্ধের নায়ক এবং পেনাল্টি এরিয়ায় সবচেয়ে বিপজ্জনক ফরোয়ার্ড হিসেবে

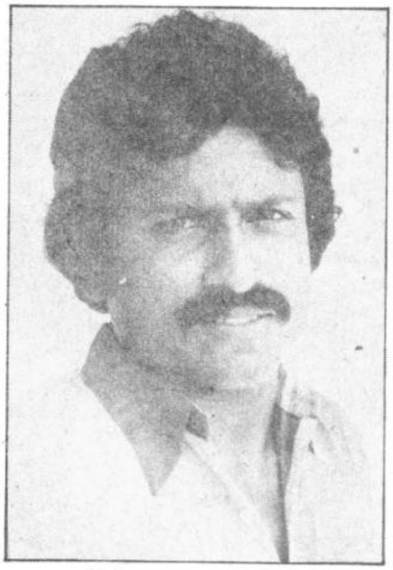

প্রেমনাথ ফিলিপ

একদা-খ্যাত শ্যাম শট নিলেন। কিন্তু সে-বল গোলে গেল না, হাইড্রোজেন ভরা বেলুনের মতো ভেসে গেল বারের ওপর দিয়ে। মহমেডান আগাগোড়াই রক্ষণাত্মক নীতি গ্রহণ করেছিল। এবং সেই কাজটি যোগ্যতার সঙ্গেই পালন করেছেন চার ডিপ-ডিফেণ্ডার। তবে ওরই মধ্যে প্রদীপ তালুকদারের একটি হেড ইস্টবেঙ্গলের গোলপোস্টের ওপর আছড়ে পড়ায় মহমেডান সমর্থকদের উল্লাস পরিণত হয় আর্তনাদে।

অতিরিক্ত সময়েও মীমাংসা না হওয়ায় শেষ অবধি টাই-ব্রেকারের সহায়তা নিতে হয়। ইস্টবেঙ্গলের গোলে ভাস্কর গাঙ্গুলি থাকায় স্বাভাবিকভাবেই পাল্লা ভারী ছিল ইস্টবেঙ্গলেরই অনুকূলে। সেই মুহূর্তে

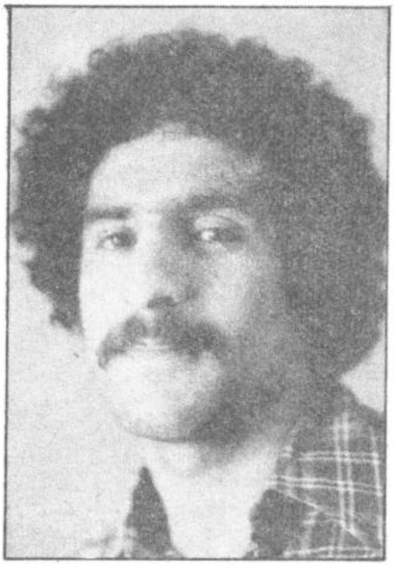

জামশিদ নাসিরি

অনেকেই ভাবতে পারেননি অতনু ভট্টাচার্য দলে থাকায় যিনি দু'নম্বর গোলকিপার হিসেবে মহমেডানের বহু ম্যাচেই সাইডলাইনের ধারে বসে ঘাস ছিঁড়েছেন, সেই দিলীপ পালই টাই-ব্রেকারে হিরো বনে যাবেন।

টাই-ভাঙার নাটকে প্রেমনাথ ফিলিপ ভাস্করের ডান দিক দিয়ে বল পাঠালেন নেটে। ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের উল্লসিত করল শ্যামের শট, গোলে ঢুকতেই (১-১)। অমিতের শট পোস্টে ধাক্কা খেল, আর মিহির বিপুল গর্জনের মধ্যে বল ঠেললেন জালে (১-২)। জামশিদের গোলে এবং অভিজ্ঞ চিন্ময়ের ভুলে লড়াইয়ে ফিরল মহমেডান (২-২)। উত্তেজনার শিকার হলেন জয়দেব এবং মনোজিৎ। দু'জনেই ব্যর্থ হলেন গোল করায়। টাইভাঙার শেষ দুটি শটে বিচক্ষণতার সঙ্গে বিশ্বজিৎ বসু ও মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য গোল করা সত্ত্বেও ফলাফল আটকে রইল এক বিন্দুতে (৩-৩)। সুতরাং সাডেন-ডেথ্। সঞ্জীব ভট্টাচার্য তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে দিয়ে গোল করে এগিয়ে দিলেন মহমেডানকে। ফলে গুরুংয়ের পায়ে ঝুলে রইল ইস্টবেঙ্গলের মরা-বাঁচা। ঠাণ্ডায় নয়, প্রচণ্ড স্নায়ু-চাপের মধ্যে হাঁটুতে কাঁপুনির করতাল বাজাতে বাজাতে গুরুং শট নিলেন। এবং অপূর্ব দক্ষতায় তা রুখে দিলেন দিলীপ পাল। ৪-৩ গোলে ইস্টবেঙ্গলকে পাহাড়-শীর্ষ থেকে ছিটকে দিয়ে গোল্ড কাপ জিতল মহমেডান।

খড়্গপুর এস. ই. রেলওয়ে বয়েজ হায়ার সেকেণ্ডারি স্কুলের অধ্যক্ষ কী বলেন

খড়্গপুরের সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে বয়েজ হায়ার সেকেণ্ডারি স্কুল মেদিনীপুর জেলার একটি নামী স্কুল। ৬৮ বছর আগে, ১৯১৬ সালে স্কুলটির যখন প্রতিষ্ঠা হয় তখন নাম ছিল বি· এন· আর হাইস্কুল।

এই স্কুলটির বর্তমান ছাত্রসংখ্যা, হিন্দি এবং বাংলা বিভাগে, প্রায় দু'হাজার। এখন দু'টি মাধ্যমে পড়ানো হয়। বাংলা বিভাগে এবার মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল ১১২ জন। প্রথম বিভাগে পাশ করেছে ১১ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ৪৫ জন। তৃতীয় বিভাগে ১৬ জন। স্টার পেয়েছে ৩ জন।

স্কুলের বর্তমান অধ্যক্ষ শ্রীউপানন্দ চট্টোপাধ্যায়। তিনি ভূগোলের এম· এ·। তাঁর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা ২৮ বছরের। তিনি এই স্কুলের অধ্যক্ষ হিসেবে কাজ করছেন ৩ বছর।

কীভাবে তৈরি হলে পরীক্ষায় ভাল ফল হবে, এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীচট্টোপাধ্যায় জানালেন, "পড়াশোনায় মনোযোগী হতে হবে। ক্লাস কামাই করা চলবে না। প্রতিদিন পড়ার সঙ্গে লেখার অভ্যাস করতে হবে। ভাষার ভুল এবং বানানভুল যাতে না হয়, সেদিকে নজর রাখতে হবে। হাতের লেখাও যথাসম্ভব ভাল করতে হবে। শুধু ক্লাসের বই-ই নয়, চিন্তা এবং জ্ঞানের ভাণ্ডার মজবুত করতে হলে নানা ধরনের বই ও পত্রপত্রিকাও পড়া দরকার।"

ইংরেজি এবং বাংলা কীভাবে পড়া উচিত, এই প্রশ্নের উত্তরে অধ্যক্ষ বললেন, "ইংরেজি এবং বাংলা দুটো বিষয়েই টেক্সট বই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়া দরকার। ইংরেজিতে নিয়মিত গ্রামার পড়তে হবে, ট্রানস্লেশন করতে হবে। বাংলাতেও একই ব্যাপার—ব্যাকরণকে অবহেলা করা উচিত নয়। ব্যাকরণ না জেনে বাংলা শেখা যায় না। ইংরেজির ক্ষেত্রেও এই একই কথা।"

অঙ্ক সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য, "অঙ্ক ভয় পাওয়ার বিষয় নয়, তবু ছেলেমেয়েরা কেন এত ভয় পায় বুঝতে পারি না। খুব ঠাণ্ডা মাথায় বুদ্ধি খরচ করে অঙ্ক বুঝতে হবে। পাটীগণিত এবং বীজগণিতের অঙ্ক প্রতিদিন অন্তত পনেরোটা করে করতে হবে। অঙ্কের মতো মজা আর-কোনো বিষয়েই নেই।"

ইতিহাস সম্পর্কে শ্রীচট্টোপাধ্যায় বললেন, "বিষয় হিসেবে ইতিহাস চমৎকার। ইতিহাসের পাঠ্যবই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে হবে। দরকার হলে মুখস্থ করতে হবে, সেটা দোষের কিছু নয়। ইতিহাসে অনেকে আবোল-তাবোল লেখে—তাদের ধারণা গাদা-গাদা লিখলে বোধহয় ঝুড়ি-ঝুড়ি নম্বর ওঠে। ভুল ধারণা। উত্তর হবে সহজ, সুন্দর এবং প্রশ্নানুগ।"

ভূগোল সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য, "ভূগোল জেনে বুঝে লিখতে হবে। এখানেও উদ্ভট, অর্থহীন লেখার সুযোগ নেই। যেটুকু লিখতে বলা হয়েছে সেটুকুই লিখতে হবে। তার বেশি নয়। ম্যাপের ব্যবহার শিখতে হবে, সেই সঙ্গে ম্যাপ আঁকার কাজটাও ভালভাবে রপ্ত করা চাই। ম্যাপ আঁকতে পারব না অথচ ভূগোলে ভাল নম্বর তুলব এটা কাজের কথা নয়।"

'আনন্দমেলা', শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের মতে, ছোটদের জন্য আদর্শ পত্রিকা। "এই পত্রিকা আমাদের ছেলেবেলায় পাইনি বলে আপসোস হয়। সত্যি চমৎকার।"

শ্যামলকান্তি দাশ

ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট বয়

খড়্গপুরের এস· ই· রেলওয়ে বয়েজ হায়ার সেকেণ্ডারি স্কুলে ক্লাস নাইন থেকে টেন-এ ফার্স্ট হয়ে উঠেছে শুভ্রজিৎ রায় ঘটক চৌধুরী। সে সিক্স থেকে এই স্কুলে পড়ছে। স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষায় মোট ৯০০ নম্বরের মধ্যে শুভ্রজিৎ পেয়েছিল ৬৪২।

শুভ্রজিৎ সারাদিনে ন-দশ ঘণ্টা পড়ে। ছুটির দিনে আর-একটু বেশি। শুভ্রজিতের দু'জন গৃহশিক্ষক আছেন। একজন বাংলা পড়ান, অন্যজন পড়ান অঙ্ক, জীবন-বিজ্ঞান আর ভৌত বিজ্ঞান। শুভ্রজিতের বাবা ইংরেজি দেখিয়ে দেন। বড় হয়ে শুভ্রজিৎ একজন নামী ডাক্তার হতে চায়।

শুভ্রজিৎ ভালবাসে ফুটবল এবং ক্রিকেট খেলতে। তার প্রিয় ক্রিকেটার গাওস্কর। ক্রিকেট এবং ফুটবল সংক্রান্ত খুঁটিনাটি খবর সংগ্রহ এবং খেলোয়াড়দের ছবি জমানো শুভ্রজিতের প্রিয় শখ।

গল্পের বই নিয়মিত পড়ে শুভ্রজিৎ। তার প্রিয় লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। অরূপরতন ভট্টাচার্য ও অমরনাথ রায়ের বিজ্ঞান বিষয়ক বই পড়তেও খুব ভাল লাগে। শুভ্রজিতের প্রিয় পত্রিকা একটি। তার নাম 'আনন্দমেলা'। "আনন্দমেলার মলাট থেকে শুরু করে শেষ পাতার বিজ্ঞাপন পর্যন্ত আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ি। সত্যিই আনন্দের মেলা।"

ফোটো : পল্লব দাশগুপ্ত

কিছু বস্তু জীবনের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে যায়,
শতবর্ষ কেটে গেলেও যার বন্ধন অটুট থেকে যায়!

শতবর্ষ আগে হয়েছিল এক পরম্পরার উদয় –
আর ঐ উদয়-সূর্য্যের উজ্জ্বল ছটা, দুনিয়ার দূর-দূরান্তের
দেশে দেশে ছড়াতেই থেকেছিল…… ঘরে ঘরে,
দিদিমা থেকে নাতনী, সবার কাছে।

সেটি ছিল সানলাইট-এর পরম্পরা – বিশুদ্ধতা ও
কোমলতায় ভরা এই পরম্পরা, যার নিত্য পরিবর্তনশীল
এই যুগও না আজ পর্য্যন্ত পেরেছে কোনো পরিবর্তন
আনতে, আর না তা কোনোদিন পারবে। কারণ, বিশুদ্ধতার
ঐ পরম্পরাকে শত শত বর্ষ ধরে কায়েম রাখার জন্যে
যে আমরা শত কঠিন কাজও হাসিমুখে করতে তৈরী রয়েছি।

সানলাইট সাবান ১০০ বছর ধরে চলে আসছে বিশ্বাসযোগ্য পরম্পরা

LINTAS SUN 11 2116 BG

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন।

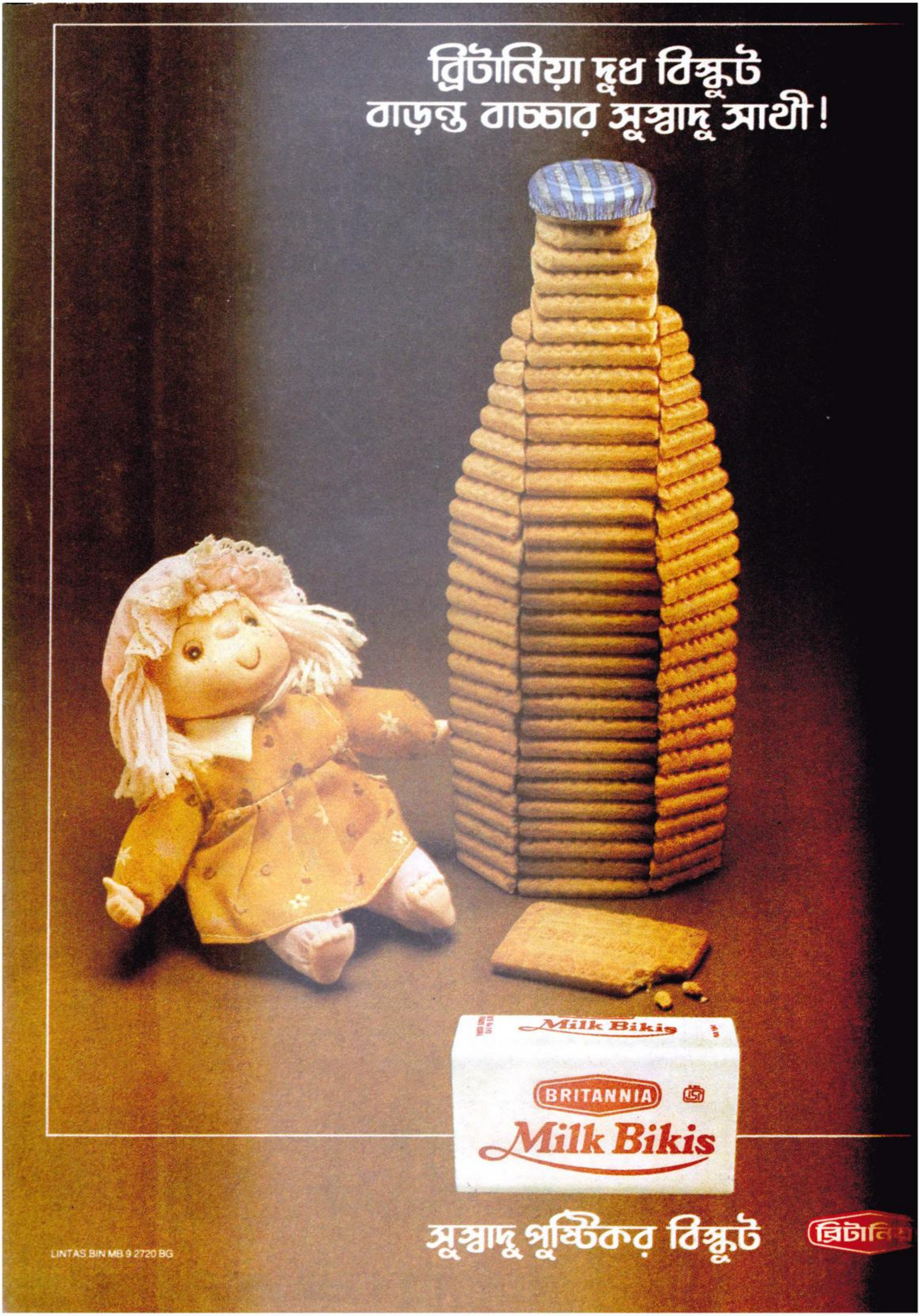
ব্রিটানিয়া দুধ বিস্কুট
বাড়ন্ত বাচ্চার সুস্বাদু সাথী!
Milk Bikis
BRITANNIA
Milk Bikis
সুস্বাদু পুষ্টিকর বিস্কুট
LINTAS BIN MB 9 2720 BG